

যখন ছেট ছিলাম



ছেলেবেলার কোন্ ঘটনা মনে থাকবে আর কোন্টা যে চিরকালের মতো মন থেকে মুছে যাবে সেটা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না । মনে থাকা আর না-থাকা জিনিসটা কোনো নিয়ম মেনে চলে না । স্মৃতির রহস্য এখানেই । পাঁচ বছর বয়সে আমি চিরকালের মতো আমার জন্মস্থান গড়পার রোডের বাড়ি ছেড়ে ভবানীপুরে চলে আসি । এই পুরাণে বাড়ি থেকে নতুন বাড়ি চলে আসার দিনটা আমি বেমালুম ভুলে গেছি, কিন্তু গড়পারে থাকতে আমাদের রাঁধুনী বামনীর ছেলে হরেনের বিষয় একটা খুব সাধারণ স্বপ্ন দেখেছিলাম সেটা আজও স্পষ্ট মনে আছে ।

আমার এই স্মৃতিকথায় তাই অনেক সামান্য ঘটনার কথা আছে, যেমন আছে কিছু নামকরা লোকের পাশে-পাশে অনেক সাধারণ লোকের কথা । সাধারণ-অসাধারণের প্রভেদ বড়দের মতো করে ছেটরা করে না ; তাই তাদের মেলামেশার কোনো বাছবিচার থাকে না । এ ব্যাপারে গুরুজনের বিচার যে ছেটরা সব সময় বোবে বা মানে তাও নয় ।

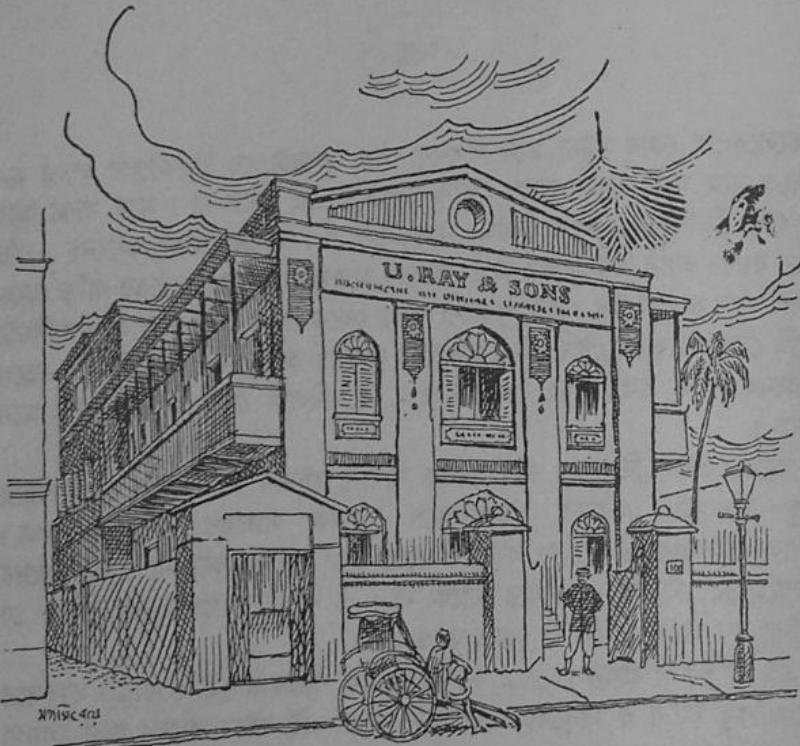
এই স্মৃতিকথা প্রথম বেরোয় সন্দেশ মাসিক পত্রিকার দ্বাই সংখ্যায় । তারপরে আরো কিছু ঘটনা ও মানুষের কথা মনে পড়ায় এই বইয়ে তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল ।

গড়পার

আমাদের ছেলেবেলায় এমন অনেক কিছু ছিল যা এখন আর নেই। বাড়ির বারান্দার রেলিং থেকে To Let লেখা বোর্ড ঝুলতে এখন আর কেউ দেখে কি ? তখন পাড়ায় পাড়ায় দেখা যেত। ছেলেবেলায় দেখেছি ওয়ালফোর্ড কোম্পানির লাল ডবল ডেকার বাসের ওপরে ছাত নেই। সে বাসের দোতলায় চড়ে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়ার একটা আলাদা মজা ছিল। রাস্তাঘাট তখন অনেক নিরিবিলি ছিল, ট্র্যাফিক জ্যামের বিভিষিকা ছিল না বললেই চলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় তফাত ছিল মোটর গাড়ির চেহারায়। কত দেশের কত রকম মোটরগাড়ি যে চলত কলকাতা শহরে তার ইয়াতা নেই। সে সব গাড়ির প্রত্যেকটার চেহারা এবং হন্নের আওয়াজ আলাদা। ঘরে বসে হ্রন্ষনে গাড়ি চেনা যেত। ফোর্ড শেভ হাস্বার ভক্সহল উলসলি ডজ ব্যুইক অস্টিন স্টুডিবেকার মরিস ওল্ডসমোবিল ওপ্যাল সিঙ্গোরী—এসব গাড়ি এখন শহর থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হৃদ খোলা গাড়ি কটা দেখা যায়। খুদে গাড়ি বেবি অস্টিন কালেভদ্রে এক-আধটা চেখে পড়ে। আর সাপের মুখওয়ালা ‘বোয়া হন’ লাগনো বিশাল ল্যানসিয়া, লাসাল—এসব আমীরী গাড়ি তো মনে হয় স্বপ্নে দেখা। কচ্ছপের খোলের মতো দেখতে প্রথম স্বীমলাইন্ড গাড়ি যখন কলকাতায় এলো, সেও তো প্রায় এক যুগ আগে। আর ঘোড়ার গাড়ি জিনিসটাও প্রায় দেখাই যায় না। আমাদের গড়পারের বাড়িতে মোটরগাড়ি ছিল না, তাই ঘোড়ার গাড়িতে আমরা অনেক চড়েছি। বাঙ্গাড়িতে আরাম কোনো দিনই ছিল না, তবে ফীটনে চড়ে বেশ মজা লাগত এটা মনে আছে।

আজকাল আকাশ কাঁপিয়ে জেট প্লেন যাতায়াত করে শহরের উপর দিয়ে। তখন এ শব্দটা ছিল মানুষের অচেনা। দুটো একটা টু সীটার প্লেন আকাশে দেখা যেত মাঝে মধ্যে। তখন দমদম আর বেহালায় ফ্লাইং ক্লাব চালু হয়েছে, বাঙালীরা প্লেন চালাতে শিখেছে। এই সব প্লেন থেকে মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনের কাগজ ফেলা হত। হাজার হাজার কাগজ এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে সেগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শহরের নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত। একবার খানকতক পড়ল আমাদের বকুলবাগানের বাড়ির ছাতে; তুলে দেখি বাটার বিজ্ঞাপন।

দৈনিক ব্যবহারের জিনিস, ওষুধপত্র ইত্যাদি যে কত বদলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নাইলনের আগের যুগের সাদা রঙের কলিনোজ টুথব্রাশ আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না। আমরা তাই করতাম, আর সেই সঙ্গে কলিনোজ টুথপেস্ট। কালো রঙের Swan আর Waterman ফাউন্টেন পেন



যা দিয়ে তৈরি হত তাকে বলত Gutta Percha। পুড়লে বিশ্রী গন্ধ বেরোত। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে সেসব কলম আজকের দিনের কলমের চেয়ে চের বেশি টেকসই ছিল।

কোয়ালিটি-ফ্যারিনির যুগে বাড়িতে Freezer দিয়ে আইসক্রীম আর কে তৈরি করে? আমাদের ছেলেবেলায় কাঠের বালতির গায়ে লাগানো লোহার হাতলের ঘড় ঘড় শব্দ শুনলে মনটা নেচে উঠত। কারণ বাড়ির তৈরি ভ্যানিলা আইসক্রীমের স্বাদের সঙ্গে কোনো ঠেলাগাড়ির আইসক্রীমের স্বাদের তুলনা চলে না।

মনে আছে ছেলেবেলায় অসুখ করলে ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন, আর সেই প্রেসক্রিপশনে দেখে মিঞ্চারের শিশি দিয়ে দিত ডাক্তারখানা থেকে। সবচেয়ে মজা লাগত শিশির গায়ে আঠা দিয়ে লাগানো দাগ কাটা কাগজের ফিতে। এ জিনিস আজকাল প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। সেকালে সদি হলে ফুট বাথ নিতে হত। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গামলায় গরম জলে পাড়ুবিয়ে বসে থাকতে হত। তাতে সদি সারত কিনা সেটা অবিশ্য মনে নেই। জোলাপের জন্য তখন খেতে হত Castor Oil—যার স্বাদে গন্ধে নাড়ীভুংড়ি উলটে আসত। ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনীনের বড় ছাড়া গতি ছিল না। আমি আবার বড় গিলতে পারতাম না। একবার ঢাকা যাবো, সেখানে ম্যালেরিয়া, কুইনীন খেতে হবে। চিবিয়ে খেয়েছিলাম সেই বড়। তার বিষ তেতো স্বাদ এখনো যেন যায়নি মুখ থেকে। ক্যাপসুল আসার পর থেকে ওষুধ জিনিসটা যে বিস্মাদ হতে পারে সেটা ভুলে গেছি আমরা।

একেবারে শিশু বয়সের কথা মানুষের খুব বেশি দিন মনে থাকে না। আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমার বয়স আড়াই বছর। সে ঘটনা আমার মনে নেই। কিন্তু বাবা যখন অসুস্থ, আর আমার বয়স দুই কিম্বা তারও কম, তখনকার দুটো ঘটনা আমার পরিকার মনে আছে।

বাবা অসুখে পড়েন আমি জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যেই। এ অসুখ আর সারেনি, তবে মাঝে মাঝে একটু সুস্থ বোধ করলে বাবাকে বাইরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হত। বাবার সঙ্গেই আমি গিয়েছিলাম একবার সোদপুর আর একবার গিরিডি। গঙ্গার উপর সোদপুরের বাড়ির উঠোনটা মনে আছে। একদিন বাবা ছবি আঁকছেন ঘরে জানালার ধারে বসে, এমন সময় হঠাৎ বললেন, ‘জাহাজ যাচ্ছে।’ আমি দোড়ে উঠেন বেরিয়ে এসে দেখলাম ভৌ বাজিয়ে একটা স্টীমার চলে গেল।

গিরিডির ঘটনায় বাবা নেই; আছে আমাদের বুড়ো চাকর প্রয়াগ। আমি আর প্রয়াগ সন্ধ্যাবেলা উন্নীর ধারে বালিতে বসে আছি। প্রয়াগ বলল, বালি খুড়লে



জল বেরোয়। আমি ভীষণ উৎসাহে বালি খুড়তে শুরু করলাম। খৌড়ার জন্য খেলনার দোকানে কেনা কাঠের খোস্তা ছিল, সেটাও মনে আছে। খৌড়ার ফলে জল বেরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সময় কোথেকে একটা দেহাতি মেয়ে এসে সেই জলে হাত ধুয়ে গেল। যে জল আমরা খুঁড়ে বার করেছি তাতে অন্য লোক এসে হাত ধুয়ে যাবে এটা ভেবে একটু রাগ হয়েছিল, তাও মনে আছে।

যে বাড়িতে আমার জন্ম, সেই একশে নম্বর গড়পার রোডে আমি ছিলাম আমার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর অনেকে বাড়িতে থেকেছি, আর সবই দক্ষিণ কলকাতায়; কিন্তু গড়পার রোডের মতো এমন একটা অস্তুত বাড়িতে আর কখনো থাকিনি।

শুধুতোবাড়ি নয়, বাড়ির সঙ্গে আবার ছাপাখানা। ঠাকুরদাদা উপেন্দ্রকিশোর নিজে নকশা করে বাড়িটা তৈরি করে তাতে থাকতে পেরেছিলেন মাত্র বছর চারেক। তিনি মারা যান আমার জন্মের সাড়ে পাঁচ বছর আগে। বাড়ির সামনে দেয়ালে উপর দিকে উঁচু উঁচু ইংরিজি হরফে লেখা ছিল ‘ইউ রায় আল্ড সন্স, প্রিন্টার্স আল্ড ব্লক মেকার্স’। গেট দিয়ে ঢুকে দারোয়ান হনুমান মিসিরের ঘর পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিডি উঠে ছিল ছাপাখানার আপিসে ঢোকার বিরাট দরজা। এক তলায় সামনের দিকটায় ছাপাখানা, আর তার ঠিক উপরে দেতলায় ছিল ব্লক তৈরি আর হরফ বসানোর ঘর। আমরা থাকতাম বাড়ির পিছন দিকটায়। বাঁয়ে গলি দিয়ে গিয়ে ডাইনে পড়ত বসতবাড়িতে ঢোকার দরজা। দরজা দিয়ে ঢুকেই সিডি। আঘায়স্বজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলে সিডি দিয়ে উঠে ডাইনে ঘুরতেন, আর ছাপার কাজের ব্যাপারে যাঁরা আসতেন তাঁরা ঘুরতেন বাঁয়ে। বাঁয়ে ঘুরে ব্লক-মেকিং ডিপার্টমেন্টের দরজা, আর ডাইনে ঘুরে আমাদের বৈঠকখানার দরজা।

আমাদের বাড়ির গায়ে পশ্চিম দিকে ছিল মুক-বধির বিদ্যালয়, আর পুরে—আমাদের বাগানের পাঁচলৈর উলটোদিকে—ছিল এথিনিয়াম ইনসিটিউশন। দুপুরটা যখন গাড়ির চলাচল থেমে গিয়ে হয়ে যেত থমথমে নিস্তর, তখন এথিনিয়াম ইস্কুল থেকে শোনা যেত ছাত্রদের নামতা পড়া আৱ বই থেকে রীড়িং পড়া, আৱ সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে মাস্টারদের ধমকানি। বিকেলে মুক-বধির বিদ্যালয়ের ছাত্রা আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের মাঠে খেলা কৰত, সে খেলা আমোৱা ছাদ থেকে দেখতে পেতাম। তবে আসল দেখার ব্যাপার হত বছৱে একবাৰ, স্কুলৰ অ্যান্যুলেল প্ৰোট্ৰেসেৰ দিন।

আমাদেৱ এই ছাতটা ছিল তিন তলায়, ঠিক ছাপাখানার উপৰে। এখানেই হত আমাদেৱ চোৱ-চোৱ খেলা আৱ ঘূড়ি ওড়ানো। বড় ছাত ছাড়াও আৱেকটা ছোট ছাত ছিল পশ্চিম দিকে। ঠাকুৰদাদাৰ কাজেৰ ঘৰ, যেটা আমি জন্ম থেকে খালিই দেখেছি, সেটাও ছিল এই তিন তলায়। এই ঘৰেৱ একটা জিনিস পৰে আমাৱ হয়ে গিয়েছিল, সেটা হল একটা কাঠেৰ বাল্ল। এই বাঞ্চে থাকত ঠাকুৰদাদাৰ রঙ, তুলি আৱ তেল-ৱেগেৰ কাজে ব্যবহাৱেৰ জন্য লিনসীড অয়েলেৰ শিশি।

তিনতলায় দক্ষিণেৰ ঘৰে থাকতেন আমাৱ মেজোকাকা বা কাকামণি—সুবিনয় রায়। বাবা মারা যাবাৱ পৰে ছাপাখানার তদাৱক কাকামণি কৰতেন। জামানি থেকে তখন নানারকম কাগজেৰ নমুনাৰ বই আসত আমাদেৱ অফিসে। মোটা, পাতলা, রেশমী, খসখসে, চকচকে, এবড়োখেবড়ো, কতৰকম যে কাগজ তার ঠিক নেই। কাকামণিৰ ঘৰে গেলে তিনি আমাৱ হাতে ওই রকম একটা বই, দিয়ে বলতেন—দেখ তো এৱ মধ্যে কোনটা চলবে। আমি বিজ্ঞেৰ মতো পৰ পৰ কাগজেৰ উপৰ হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলবে কি চলবে না বলে দিতাম। আমাৱ ধাৰণা ছিল আমাৱ বাছাই কৰা কাগজই আসবে জামানি থেকে।

কাকামণিৰ ছেলে সৱল ছিল আমাৱ একমাত্ৰ আপন খুড়তুতো দাদা। তবে দাদা আৱ কাকীমা অনেক সময়ই থাকতেন কাকাৰ খণ্ডৰবাড়ি জৰুৰপুৰে। দাদাৱ পড়াশুনা হয়েছিল সেখানেই, সাহেব ইস্কুলে। দাদাৱ ভালো নাম ছিল সৱল। ইস্কুলে সাহেবেৰ ছেলেৰা দাদাকে ডাকত সিৱিল (Cyril) বলে।

তিনতলাতেই আৱেকটা ঘৰে থাকতেন আমাৱ ছোটকাকা সুবিমল রায়। পৰে ছোটকাকাৰ সঙ্গ পেয়েছি অনেক; গড়পাৱে তাঁৰ সম্বন্ধে যে কথাটা মনে আছে সেটা হল এই যে ছোটকাকাৰ ভাত খেতে সময় লাগত আমাদেৱ চেয়ে বাড়া এক ঘণ্টা বেশি। কাৰণ তাঁৰ নিয়ম ছিল প্ৰতিটি গ্ৰাস বত্ৰিশ বাৱ কৰে চিবোনো। এ না কৱলে নাকি খাদ্য হজম হয় না।

আমি আৱ মা থাকতাম দোতলায় দক্ষিণে, কাকামণিৰ ঘৰেৱ ঠিক নিচেৰ ঘৰে। পশ্চিমেৰ একটা ঘৰে থাকতেন বিধবা ঠাকুমা, যাঁৰ সঙ্গে আমাৱ অনেকটা

যখন ছোট ছিলাম

সময় কেটেছে ঝুড়ি থেকে পুৱানো সদেশেৰ ছবিৰ ব্লক বাছাই কৰে বেড়ে পুছে আলাদা কৰে রাখতে। ঠাকুমা মাৱা যান আমি গড়পাৱে থাকতে-থাকতেই।

গড়পাৱে সব চেয়ে বেশি মনে আছে আমাৱ ধনদাদু কুলদারঞ্জন রায়কে। উনি থাকতেন একতলায় আমাদেৱ শোবাৰ ঘৰেৱ ঠিক নিচেৰ ঘৰে। দাদু মুগুৰ ভাঁজতেন, দাদু মৃত লোকেৰ ছবি এনলাৰ্জ কৰতেন, দাদু আমাকে পুৱাগেৰ গল্প বলতেন, আৱ দাদু এককালে ক্ৰিকেট খেলতেন। জাঁদৱেল সাহেব-টীম ক্যালকাটাৰ বিৰুদ্ধে বাঙালী টীম টাউন ক্লাবেৰ হয়ে দাদু একবাৱ নিৱানবহুইয়েৰ গাঁটে আটকে গিয়ে শেষ পৰ্যন্ত কীভাৱে সেঞ্চুৱি কৱেছিলেন, সে গল্প তাঁৰ কাছে অনেকবাৱ শুনেছি। আমি যখন দাদুকে দেখেছি তখন তাঁৰ আৱ খেলাৰ বয়স নেই। কিন্তু খেলা দেখাৰ উৎসাহ তাঁৰ জীবনেৰ শেষ অবধি ছিল। এম. সি. সি অস্ট্ৰেলিয়াৰ দল কলকাতায় এলে দাদুৰ মন পড়ে থাকত ইডেনেৰ মাঠে।

দাদুৰ পেশা ছিল ছবি এনলাৰ্জ কৰা। ছোট থেকে বড় কৰা ছবি ফিনিশ কৰাৱ কাজটা তাঁৰ নিজেৰ ঘৰেই কৰতেন তিনি। তেল রঙে ছবি আঁকাৰ জন্য যেমন ইংজেল থাকে, তেমনি ইংজেলে এনলাৰ্জ কৰা ছবি খাড়া কৰে রেখে পা দিয়ে একটা হাপৱেৰ মতো জিনিস দাবিয়ে হাতে ধৰা এয়াৰুৱাশেৰ সৰু মুখ দিয়ে রঙেৰ স্পে বাব কৰে ফিনিশ কৰাৱ কাজ চলত, আৱ আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। বেশিৰ ভাগ ছবিই হত কালচে বা খয়েৱি রঙে, কিন্তু একবাৱ মনে আছে নাটোৱেৰ মহারাজা জগদিন্দ্ৰনারায়ণেৰ ছবি ফিনিশ কৰছেন রঙ দিয়ে, গাছপালায় সবুজ, কাশীৱী শালেৰ গায়ে লাল। পাশে বসে নতুন মহারাজা যোগীন্দ্ৰনারায়ণ দাদুৰ কাজ দেখছেন এটাও মনে আছে।

চেনাশোনা বাড়িতে কেউ মাৱা গেলেই দাদুৰ কাছে অৰ্ডাৰ আসত ছবি এনলাৰ্জ কৰাৱ জন্য। হয়ত গ্ৰুপ ফোটোতে ছোট একটা মুখ, তাও খুব স্পষ্ট নয়, সেটাই যখন দাদুৰ হাতে বড় হয়ে ফিনিশ হয়ে বাঁধিয়ে আসত, তখন মনে হত আসল মানুষটা যেন ছবি থেকে চেয়ে আছে আমাদেৱ দিকে। কেউ মাৱা যাবাৱ কয়েক দিনেৰ মধ্যেই দাদুকে দেখা যেত বগলে ব্ৰাউন পেপাৱে মোড়া বাঁধানো ছবি নিয়ে এসে হাজিৰ। সে ছবি খুলে সকলৈৰ সামনে টেবিলেৰ উপৰ দাঁড় কৱানো হত, আৱ ছবিৰ দিকে চেয়ে মৃত ব্যক্তিৰ আঞ্চলিক চোখে দেখা অনেকবাৱ।

গড়পাৱে থাকতেই ইউ রায় আস্ত সঙ্গ থেকে দাদুৰ লেখা অনেক ছোটদেৱ বই বেৱিয়ে গিয়েছিল—ইলিয়াত, ওডিসিউস, পুৱাগেৰ গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্ৰিশ সিংহাসন, কথাসৱিত্সাগৱ। এইসব বই ডাঁই কৰে রাখা থাকত ছাপাখানার দোতলায় একটা পাৰ্টিশন দেওয়া ঘৰেৱ মধ্যে। এৱ অনেক গল্পই অবিশ্য আগে সদেশ পত্ৰিকায় বেৱিয়েছিল।

বাবা মারা যাবার দু'বছর পর অবধি সন্দেশ পত্রিকা বেরিয়েছিল। একতলার ছাপাখানায় সন্দেশ ছাপা হচ্ছে, তার তিনি রঙের মলাট ছাপা হচ্ছে, একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ছাপাখানায় টু মারার সময়টা ছিল দুপুর বেলা। দোতলাতেই যাওয়া হত বেশি। চুকলেই দেখা যেত ডাইনে সারি সারি কম্পেজিটারের দল তাদের খোপ কাটা হৱফের বাস্তৱের উপর ঝুকে পড়ে হৱফ বেছে বেছে পর পর বসিয়ে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে লাইন তৈরি করছেন। সকলেরই মুখ চেনা হয়ে গিয়েছিল, ঘরে চুকলে সকলেই আমার দিকে চেয়ে হাসতেন। আমি তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম ঘরের পিছন দিকে। আজও তারপিন তেলের গন্ধ পেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইউ রায় অ্যাস্ট সন্সের ব্লক মেকিং ডিপার্টমেন্টের ছবি। ঘরের মাঝখানে রাখা বিৱাট প্রোসেস ক্যামেৰা। ক্যামেৰার কাজ যে শিখে নিয়েছিল বেশ পাকা ভাবে, সেই রামদহিন প্রেসে যোগ দিয়েছিল সামান্য বেয়ারা হিসাবে। বিহারের ছেলে। ঠাকুরদা নিজে হাতে তাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। রামদহিন ছিল প্রায় ঘরের লোকের মতো, আর তার কাছেই ছিল আমার যত আবদার। একটা কাগজে হিজিবিজি কিছু একে নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিয়ে বলতাম, ‘রামদহিন, এটা সন্দেশে বেরোবে।’ রামদহিন তক্ষুনি মাথা নেড়ে বলে দিত, ‘হাঁ খোখাবাবু, হাঁ।’ শুধু তাই না; আমার ছবি ক্যামেৰার নিচের দিকে মুখ করা লেন্সের তলায় বিছিয়ে রেখে আমাকে কোলে তুলে ক্যামেৰার পিছনের ঘষা কাঁচে দেখিয়ে দিত সে ছবির উল্টো ছায়া।

পড়াশুনা গড়পারে কী করেছি তা ঠিক মনে পড়ে না। একটা আবছা স্মৃতি আছে যে ধনদাদুর মেয়ে বুলুপিসি আমাকে ইংরিজি প্রথম ভাগ পড়াচ্ছেন। বইয়ের নাম ছিল Step by Step। সেটার চেহারাও মনে পড়ে। মা-ও পড়াতেন নিশ্চয়ই, তবে যেটা মনে পড়ে সেটা হল তিনি ইংরিজি গল্প পড়ে বাংলা করে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে দুটো ভয়ের গল্প কোনোদিন ভুলিনি: কোন্যান ডয়েনের ব্লু জন গাপ আর ব্রেজিলিয়ান ক্যাট।

বুলুপিসির পরের বোন ছিল তুতুপিসি। তিনি থাকতেন আমাদের বাড়ি থেকে তিনি মিনিটের হাঁটা পথ আপার সার্কুলার রোডে। আমাদের বাড়িতে কারুর কোনো বড় অসুখ করলে মা লেগে যেতেন সেবার কাজে। তখন আমি চলে যেতাম তুতুপিসির বাড়ি। জানালার শার্সিতে লাল-নীল-হলদে-সবুজ কাঁচ লাগানো মোজাইকের মেঝেওয়ালা এই আদিকালের বাড়িটা আমার খুব মজার লাগত। সামনে বারান্দা ছিল একেবারে বড় রাস্তার উপর। তার একধারে রেলের লাইন, সে লাইন দিয়ে যাতায়াত করে ছোট রেলগাড়ি। যতদূর মনে পড়ে সে গাড়িতে মানুষ যাতায়াত করত না। সেটা ছিল মালগাড়ি; শহরের আবর্জনা নিয়ে যাওয়া হত ধাপার মাঠে ফেলার জন্য। লোকে ঠাট্টা করে বলতে ‘ধাপা মেল’।

তুতুপিসির বাড়িতে যে ক'দিন থাকতাম সে ক'দিন আমার পড়াশুনার ভাব তিনিই নিতেন। আর পিসেমশাই কাজ থেকে ফিরে বিকেলে তার গাড়িতে নিয়ে যেতেন বেড়াতে। বাড়ির অসুখ সেৱে গেলে আবার ফিরে যেতাম গড়পারে।

বাড়িতে থাকতে বিকেলে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম স্যার জগদীশ বোসের বাড়িতে। এ বাড়িও আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ, সেই আপার সার্কুলার রোডেই। জগদীশ বোস তখন বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিদের একজন; গাছের প্রাণ আছে সেটা তিনি আবিষ্কার করেছেন, আর তার জন্য ‘স্যার’ উপাধি পেয়েছেন। অবিশ্যি আমরা তাঁর বাড়ি যেতাম তাঁকে দেখতে নয়, তাঁর বাগানের একপাশে যে চিড়িয়াখানা ছিল সেইটে দেখতে।

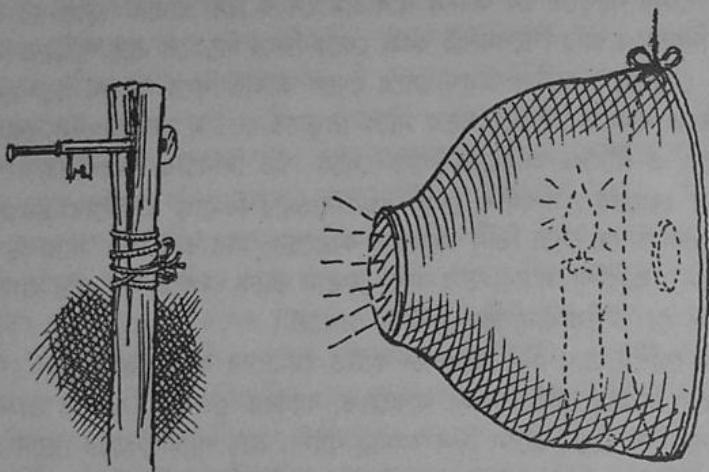
তবে বেশির ভাগ দিন বিকেলটা কাটত আমাদের বাড়ির ছাতে।

আমার নিজের ভাইবোন না থাকলেও, বাড়িতে যে সঙ্গী ছিল না তা নয়। রাঁধুনী বামনীর ছেলে হরেন ছিল আমার বয়সী, আর শ্যামা বিয়ের ছেলে ছেদি আমার চেয়ে বছর চার-পাঁচের বড়। শ্যামার বাড়ি ছিল মতিহারি। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলত, তবে কোনো কারণে অবাক হলে গালে হাত চলে যেত, আর সেই সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত—‘আ-গে—মইনী! দেখতো পহিলে!’ ছেদি বাংলা শিখেছিল। তার অনেক গুণের মধ্যে একটা ছিল ঘুড়ির পাঁচে কেরামতি। মাঞ্জা দেবার কাজটা আমাদের ছাতেই তিনটি লোহার থামের গায়ে সূতো পেঁচিয়ে হয়ে যেত। লাটাই ধরার ভাব ছিল আমার উপর। বিশ্বকর্মার পুজোর দিনে যখন উত্তর কলকাতার আকাশ ঘুড়িতে ছেয়ে যেত তখনই দেখা যেত ছেদির কেরামতি। চারিদিকে ছাত থেকে পাঁচওয়ালাদের চিংকারে পাড়া মেতে উঠত—‘দুয়োকো! বাড়েনাকো! ’ ‘দুয়োকো! পাঁচ লড়েনাকো! ’ আর ঘুড়ি কাটলেই ‘ভোকাটা! ’

ছেদির হাতের কাজ বেশ ভালো ছিল। দশ বারো বছর বয়সেই নিজে রঙিন পাতলা কাগজ জুড়ে ফানুস তৈরি করত যেটা আমরা কালীপুজোর দিন ছাত থেকে ওড়াতাম। এ ছাড়া আরো দুটো জিনিস ছেদি তৈরি করত যেটা আমি আর কাউকে করতে দেখিনি।

এক হল চাবি পট্টকা। একটা হাতখানেক লম্বা বাঁখারি নিয়ে তার মাথার দিকের খানিকটা চিরে তার মধ্যে একটা চাবিটা সমকোণে বেরিয়ে থাকে বাঁখারি থেকে। চাবি সাধারণত দু'রকমের হয়—মাথা বড় আর মাথা ফুটো। এই ব্যাপারে দরকার দ্বিতীয় ধরনের চাবি কারণ ওই ফুটোর মধ্যে পুরতে হবে বারুদ। ছেদি দেশলাইয়ের মাথা থেকে বারুদ নিয়ে চুকিয়ে দিত ফুটোর মধ্যে।

এবারে সেই ফুটোয় ঢোকাতে হবে একটা বেশ আঁট-ফিটিং পেরেক, যাতে



পেরেকের তলা আর বারুদের মাঝখানে ইঞ্চি খানেকের একটা ফাঁক থাকে।
এবার বাঁখারিটা হাতে শক্ত করে ধরে পেরেকের মাথাটা সঙ্গে দেয়ালে
মারলেই বায়ুর চাপে চাবির ভিতরে বারুদ বোমার মতো শব্দ করে ফেটে উঠত।

এছাড়া ছেদি দইয়ের ভাঁড় দিয়ে একরকম লণ্ঠন তৈরি করত যেটা ভারী মজার
লাগত আমার। ভাঁড়ের তলার গোল অংশটা কেটে বাদ দিয়ে তার জায়গায়
লাগিয়ে দিত একটা রঙিন কাচ। তারপর ভাঁড়ের ভিতর পাশটায় একটা
মোমবাতি দাঁড় করিয়ে, সেটাকে জালিয়ে ভাঁড়ের মুখটা বন্ধ করে দিত একটা
ফুটোওয়ালা পিচবোর্ড দিয়ে। ফুটোর দরকার, কারণ বাতাস না পেলে মোমবাতি
জ্বলবে না।

সবশেষে ভাঁড়ের কানায় বাঁধা দড়ি হাতে নিয়ে অঙ্ককারে ঘোরাফেরা করলেই
দেখা যেত বঙ্গের কাচের মধ্যে দিয়ে রঙিন আলো বেরিয়ে পড়ে দিব্যি একটা
বাহারের লণ্ঠনের চেহারা নিয়েছে।

ঠাকুরদার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দু'ভাই ছাড়া সকলেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন।
সারদারঞ্জন ও মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন বড় এবং সেজো ভাই। ওঁদের বলতাম বড়দাদু
আর মুক্তিদাদু। ওঁদের বাড়িতে গেলেই দেখতে পেতাম বৌয়েদের সিথেয় সিদুর,
শাড়ি পরার চং আলাদা, পুরুষদের হাতে মাদুলি। পুজোর ঘর থেকে শোনা যেত
শাঁখ আর ঘন্টার শব্দ, খুড়িমা-ঠাকুরার প্রসাদ এনে খাওয়াতেন আমাদের। কিন্তু
এই তফাত সত্ত্বেও ওঁদের পৰ-পর মনে হয়নি কথনো। সত্যি বলতে কী, এক

যখন ছোট ছিলাম

ধর্মের ব্যাপারে ছাড়া, ঠাকুরদাদাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিল ছিল অনেক। হিন্দু
সারদা মুক্তিদা যেমন খেলাধুলা করতেন, মাছ ধরতেন, তেমনি করতেন ব্রাহ্ম
কুলদা। ক্রিকেট শুরু করেন সারদা, তারপর সেটা রায় পরিবারে হিন্দু ব্রাহ্ম সব
দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খেলাটা সত্যি করে শিকড় গেড়েছিল আমার সোনাঠাকুমার বাড়িতে।
সোনাঠাকুমা হলেন আমার ঠাকুরদাদার বোন। এনার বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম বোস
পরিবারে। স্বামী হেমেন বোসের ছিল পারফিউমারি বা গন্ধদ্রব্যের কারবার।

কেশে মাখো কৃষ্ণলীন

কুমালেতে দেলখোশ

পানে খাও তাম্বুলীন

ধন্য হোক এইচ বোস।

—এই চার লাইনের কবিতা দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরোত তখন কাগজে কাগজে।
গন্ধদ্রব্য ছাড়াও এইচ বোস আরেকটা ব্যবসা চালিয়েছিলেন কিছুদিন। সেটা
ছিল এক ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গে একজোটে গ্রামফোন রেকর্ডের ব্যবসা। সে
রেকর্ড আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি। রেকর্ড ঘুরতো উলটো দিকে, আর পিন
সমেত সাউন্ড বৰু নড়ত মাঝখান থেকে বাইরের দিকে।

সোনাঠাকুমা ছিলেন চৌদজন ছেলেমেয়ের মা। গায়ের রং ধপধপে, আশী
বছর বেঁচেছিলেন, শেষ দিন অবধি একটা চুল পাকেনি, একটা দাঁত পড়েনি।

চার মেয়ের বড় মেয়ে মালতী তখনকার দিনের নামকরা গাইয়ে। বড় ছেলে
হিতেনকাকা পাকা আঁকিয়ে, ওস্তাদী গানের সমবাদার, ফারসী জানেন, দামী
দৃষ্টান্তবই সংগ্রহ করেন। টকটকে রং, সুপুরুষ চেহারা। আরেকে ভাই নীতীন
(পুতুলকাকা) পরে নামকরা সিনেমা পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান হয়েছিলেন।
আমার ছেলেবয়সে মনে আছে তিনি নিজেই ছোট মূভী ক্যামেরা দিয়ে আসামে
খেদয় হাতি ধরার ছবি তুলে এনে দেখিয়েছিলেন, আর পরে সে ছবি বিলিতি
কোম্পানীকে বিক্রী করেছিলেন।

পরের ভাই মুকুলের পায়ের ব্যারাম, তিনি খুড়িয়ে হাঁটেন। পড়াশুনা খুব
বেশির করেননি, কিন্তু যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অসাধারণ মাথা। উত্তিদবিজ্ঞানী
জগদীশ বোসের সূক্ষ্ম সব গবেষণার যন্ত্র কলকাতায় একমাত্র উনিই সারাতে
পারেন। পরে ইনিই সিনেমা লাইনে গিয়ে সাউন্ড রেকর্ডিংস্ট হিসেবে বিশেষ নাম
করেছিলেন।

তার পরের চার ভাই কার্তিক গণেশ বাপী বাবু সকলেই ক্রিকেট খেলে। আমি
যখন ছোট, তখন কার্তিক সবে নাম করেছে, আর সবাই বলছে বাঙালীদের মধ্যে
এমন ব্যাটসম্যান হয়নি। অ্যামহাস্ট স্ট্রাটে ওদের বাড়িতে সক্ষেবেলা গেলেই দেখা

যায়, হয় কাৰ্ত্তিককাকা, না হয় গণেশকাকা, একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
ব্যাট হাতে ষ্ট্ৰোক প্র্যাকটিস কৰছে। বাড়িৰ মাঠে শানবাঁধানো পিচ ছিল, আৱ
ব্যাটিং অভ্যাস কৰাৰ জন্য আলাদা ব্যাট ছিল, যাৰ দু'পাশ চেঁচে ফেলে শুধু
মাঝখানেৰ অংশটা রাখা হয়েছে।

সব মিলিয়ে অ্যামহার্স্ট স্ট্ৰাইটে বোসেদেৱ বাড়িৰ মতো হৈ-হল্লোডেৱ বাড়ি আমি
দুটো দেখিনি।

একটা ব্যাপারে সেই ছেলেবয়সে মনটা একটু খুতখুত কৰত বৈকি। ব্ৰাহ্মদেৱ
মাঘোৎসবে হিন্দু পুজোৰ মতো হৈ-হল্লা নেই। কেবল ব্ৰহ্মোপাসনা আৱ
ভগবানীৰ বিষয় গান শোনা। একটি ব্ৰহ্মোপাসনা মানে দেড় থকে দু'ঘণ্টা।
আমদেৱ বাড়িতে শ্ৰাদ্ধতিথিতে উপাসনাৰ রেওয়াজ ছিল। বসবাৱ ঘৰেৱ
চেয়াৰ-টেবিল সৱিয়ে শ্ৰেতপাথৰেৱ মেৰেৱ উপৰ সুজনি বিছিয়ে দেওয়া হত,
আমৱাৰ তাৰ উপৰে বসতাম। তাৰপৰ হত উপাসনা আৱ গান। আমৱাৰ মা খুব
ভালো গাইতেন, তবে উপাসনাৰ দিন যাৱা তেমন ভালো গান না—যেমন আমৱাৰ
ধনদাদু বা কাকামণি—তাঁৰাও গানে যোগ দিতেন। বছৱেৱ পৰ বছৱ একই
সুজনিৰ উপৰ মাথা হেঁট কৰে বসে উপাসনা শুনে আমৱাৰ সুজনিৰ নকশা
একেবাৰে মুখষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আৱ মুখষ্ট হয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত স্তোত্ৰ আৱ তাৰ বাংলাগুলো। এই বাংলা
বলাৰ একটা নিয়ম ছিল যেটা সব আচাৰ্যই মানতেন। এই নিয়মে সব কথা টেনে
টেনে বলতে হয়। যেমন, ‘অসতো মা সদগময়’ মন্ত্ৰেৱ প্ৰথম তিন লাইনেৱ বাংলা
এই ভাবে বলা হত—

‘অসত—হইতে—আমা—দিগ—কে—সত্তো—তে—লইয়া—যাও—,
অন্ধকা—ৰ—হইতে—আমা—দিগ—কে—আলোকে—লইয়া—যাও—,
মৃত্যু—হইতে—আমা—দিগ—কে—অমৃতে—তে—লইয়া—যাও—’

এই ‘সত্তো—তে—’ আৱ ‘অমৃতে—তে—’-ৰ ব্যাপারে ভীষণ খটকা
লাগত। ওৱেকম কৰে না বলে ‘সত্তো লইয়া যাও’, আৱ ‘অমৃতে লইয়া যাও’
বললেইতোহয়। কিংবা শেষে যদি আৱেকটা ‘তে’ জুড়তেই হয় তাহলে ‘সত্ততে’
আৱ ‘অমৃততে’ বললে কী ভুল হয়? কিন্তু আচাৰ্যদেৱ মনে নিশ্চয়ই এ খটকা
লাগেনি, না হলে তাঁৰা সকলেই বছৱেৱ পৰ বছৱ এই একই ভাবে বলে চলবেন
কেন?

ব্ৰাহ্ম মন্দিৰ একটা ভবানীপুৰেও আছে আৱ সেখানেও মাঘোৎসব হয়। কিন্তু
আমৱা যখন গড়পাৰ ছেড়ে ভবানীপুৰে চলে আসি তখনও এগাৱোই মাঘেৱ বড়
উৎসবেৱ দিন আমৱা কৰ্ণওয়ালিস স্ট্ৰাইটেৱ ব্ৰাহ্ম মন্দিৱেই যেতাম। ওই
পাড়াটাকেই বলত সমাজ পাড়া। শীতকালেৱ ভোৱ সাড়ে চারটেয় উঠে স্বান কৰে

যেতে হত। প্ৰথমে হত ঘণ্টা খানেক ব্ৰহ্মকীৰ্তন, তাৰপৰ ঘণ্টা আড়াই গান ও
উপাসনা। বসাৱ ব্যবস্থা কাঠেৱ বেঢ়িতে, তাৰ পিঠ এতই সোজা যে তাতে
আৱামেৱ কোনো প্ৰশ়াই ওঠে না।

মাঘোৎসবেৱ শুধু তিনটো দিন আমদেৱ একটু আমোদ হত। সেটা হল একটা
বিশেষ দিনে উপাসনাৰ পৰ খিচুড়ি খাওয়া, একটা দিন পিকনিক, আৱ একটা দিন
বালক-বালিকা সম্মেলন। এই শেষ ব্যাপারটায় গুৰুগন্ধীৰ উপাসনাৰ কোনো
বালাই নেই।

কিন্তু তাহলেও ঢাক ঢেল বাজিয়ে প্যান্ডুল খাটিয়ে ঠাকুৱ সাজিয়ে হিন্দু
পুজোৰ যে একটা হৈ-হল্লা জাঁকজমকেৱ দিক আছে, সেটা ব্ৰাহ্ম উৎসবে মোটেই
ছিল না। কালীপুজোয় বাজি পোড়ানো ফানুস ওড়ানোয় আমৱাও যোগ দিতাম
বটে,

আৱ	আমদেৱ
----	-------

ছেলেবেলাৱ
তুবড়ি-হাউই-ফুলবুৱি-ৱংমশাল-চটপটি-চীনেপটকা মিলিয়ে যে আনন্দ সেটা
আজকালকাৱ কান-ফাটানো বুক-কাঁপানো বোম-পট্কাৱ যুগে একেবাৱেই
নেই—কিন্তু বছৱেৱ বিশেষ ক'টা দিনে সাৱা শহৰ মিলে আমোদ কৰাৱ ব্যাপারটা
ব্ৰাহ্মদেৱ মধ্যে ছিল না।

তাই বোধহয় শ্রীস্টান্দেৱ বড়দিনটাকে নিজেদেৱ পৰবেৱ মধ্যে চুকিয়ে নেবাৱ
একটা চেষ্টা ছিল সব সময়। বড়দিন এলে মনটা নেচে উঠত সেই কাৰণেই।

কলকাতায় তখন সাহেবদেৱ বড় দোকান (আজকাল যাকে বলে ডিপার্টমেন্ট
স্টোৱ) ছিল হোয়াইটআওয়ে লেইড্ল। চৌৰঙ্গীতে এখন যেখানে মেট্ৰো সিনেমা
তখন সেখানে ছিল স্টেটসম্যান পত্ৰিকাৰ অফিস। তাৰ পাশে সুৱেন ব্যানার্জি
ৱোডেৱ মোড়ে ঘড়িওয়ালা বড় বাড়িটা ছিল হোয়াইটআওয়েৱ বাড়ি। বিশাল
দোতলা দোকানেৱ পুৱে দোতলাটা বড়দিনেৱ ক'টা দিন হয়ে যেত ‘টয়ল্যান্ড’।
একবাৱ মা’ৰ সঙ্গে গেলাম এই টয়ল্যান্ড দেখতে।

তখন দেশে সাহেবদেৱ রাজত্ব। হোয়াইটআওয়ে সাহেবদেৱ দোকান।
বিক্ৰেতাৱা সব সাহেব; যাৱা খন্দেৱ তাৰেও বেশিৰ ভাগই সাহেব মেমসাহেব।
গিয়ে সব দেখেটোখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু টয়ল্যান্ডে যে যাৰ, দোতলাৱ
সিডি কই? জীবনে সেই প্ৰথম জানলাম লিফ্ট কাকে বলে। হোয়াইটআওয়েৱ
দোকানেৱ লিফ্টই বোধহয় কলকাতাৰ প্ৰথম লিফ্ট।

সোনালী রঙ কৰা লোহার খাঁচায় দোতলায় উঠে এসে মনে হল স্বপ্নৱাজে
এসেছি। মেৰেৱ অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড় নদী ব্ৰিজ টানেল সিগন্যাল
স্টেশন সমেত খেলাৱ রেলগাড়ি একেবেঁকে চকুৱ মেৰে চলেছে রেললাইন দিয়ে।
এ ছাড়া ঘৰেৱ চাৰদিকে রয়েছে নানা রঙেৱ বেলুন, রঙিন কাগজেৱ শিকল,
ঝালুৱ, ফুল ফুল আৱ চীনে লঞ্ছন। তাৰ উপৰে রঙবেৱেৱেৱ বল আৱ তাৱায় ভৱা

ক্রিসমাস ট্রী, আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখ টানছে—গালফোলা হাসি নিয়ে
দাঢ়িয়ুথো লাল জামা লাল টুপি পরা তিন মানুষ সমান বড় ফাদার ক্রিসমাস।

খেলনা যা আছে তা সবই বিলিতি। তার মধ্যে থেকে আমাদের সাধ্যে কুলোয়
এমন এক বাক্স ক্র্যাকার নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সেরকম ক্র্যাকার আজকাল আর
নেই। তার যেমনি আওয়াজ, তেমনি সুন্দর তার ভিতরের খুদে খুদে
জিনিসগুলো।

বড় আর বাহারের দোকান বলতে তখন যা ছিল তার বেশির ভাগই
চৌরঙ্গীতে। তার মধ্যে হোয়াইটআওয়ের কাছেই একটা দোকান ছিল যেটা
বাঙালীর দোকান। কার এন্ড মহলানবিশ। গ্রামোফোন আর খেলার সরঞ্জামের
দোকান। দোকানে বসতেন যিনি, তাঁকে আমরা কাকা বলতাম—বুলাকাকা। এই
দোকানে একটা বাহারের চেয়ার ছিল যেটা আসলে একটা ওয়েইং মেশিন।
চৌরঙ্গী অঞ্চলে গেলেই বুলাকাকার দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসে ওজন হয়ে
আসাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাবা মারা যাবার পরে এই
বুলাকাকাই আমাকে এনে দিয়েছিলেন একটা গ্রামোফোন। সেই থেকে আমার
গ্রামোফোন আর রেকর্ডের শখ। আমার নিজের দুটো খেলনা গ্রামোফোন
ছিল—সেগুলোও সম্ভবত বুলাকাকারই দেওয়া। একটার নাম পিগমিফোন,
একটার কিডিফোন। তাদের সঙ্গে বেশ কিছু বিলিতি গান-বাজনার রেকর্ডও ছিল
লুট্রিচ সাইজের।

কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে বুলাকাকাই আমাকে
জন্মদিনে একটা রেডিও উপহার দিয়েছিলেন। সে রেডিও আজকের দিনের
রেডিওর মতো নয়। তাকে বলত ক্রিস্ট্যাল সেট। কানে হেড-ফোন লাগিয়ে
শুনতে হত; অর্থাৎ এক সঙ্গে একজনের বেশি শুনতে পেত না রেডিও
প্রোগ্রাম।

বুলাকাকার সঙ্গেই আমরা একবার গিয়েছিলাম উটরাম রেস্টোরাণ্টে। উটরাম
ঘাটে এই বাহারের রেস্টোরাণ্টটা জলের উপর ভাসত। দেখতে ঠিক জাহাজের
ডেকের মতো। এখন উটরাম ঘাটে গেলে আগের সেই চেহারাটা আর দেখা যাবে
না। তখন ঘাটের উল্টোদিকে ইডেন গার্ডেনের চারদিকে বাহারের গ্যাসের বাতি
জ্বলত, আর বাগানের মাঝখানে ব্যাস্ট্যাল্ডে সন্ধ্যাবেলা বাজত গোরাদের ব্যান্ড।
উটরাম রেস্টোরাণ্টে আমি জীবনে প্রথম আইসক্রীম খাই। অবিশ্য এই নিয়ে পরে
অনেকদিন ঠাট্টা শুনতে হয়েছিল; কারণ প্রথম চামচ মুখে দিয়ে দাঁত ভীষণ
সিরিসির করায় আমি বলেছিলাম আইসক্রীমটা একটু গরম করে দিতে।

ভবানীপুর

মন্দেশ পত্রিকা বন্ধ হবার কিছুদিন পরেই যে ইউ রায় আস্ত সন্সের ব্যবসাও
কেন উঠে গেল, সেটা অত ছেলেবয়সে আমি জানতেই পারিনি। শুধু
শুনলাম মা একদিন বললেন আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

গড়পার ছেড়ে, আর সেই সঙ্গে উন্নত কলকাতা ছেড়ে, আমরা দুজন চলে
এলাম ভবানীপুরে আমার মামার বাড়িতে। আমার বয়স তখন ছয়ের কাছাকাছি।
আমার মনে হয় না সে বয়সে বড় বাড়ি থেকে ছেট বাড়ি, বা ভালো অবস্থা থেকে
সাধারণ অবস্থায় গেলে মনে বিশেষ কষ্ট হয়। ‘আহা বেচারা’ কথাটা ছেটদের
সম্বন্ধে বড়বাই ব্যবহার করে; ছেটো নিজেদের বেচারা বলে ভাবে না।

ভবানীপুরে বকুলবাগানের বাড়িতে এসেই যেটা আমাকে অবাক করেছিল
সেটা হল চীনে মাটির টুকরো বসানো নকশা করা মেঝে। এ জিনিস এর আগে
কখনো দেখিনি। অবাক হয়ে দেখতাম, আর মনে হত, বাপের বাপ, না জানি কত
পেয়ালা পিরিচ প্লেট ভেঙে তৈরি হয়েছে এই মেঝে! টুকরোগুলোর বেশির
ভাগই সাদা, তবে তার মধ্যে হঠাৎ একএকটার কোণে হয়ত এক চিলতে ফুল, বা
তারা, বা টেউখেলানো লাইন। কিছু করার না থাকলে এই চীনে মাটির
টুকরোগুলো দেখে অনেকটা সময় কেটে যেত।

আরেকটা ভালো জিনিস ছিল এ বাড়িতে যেটা গড়পারে পাইনি। সেটা হল
রাস্তার দিকে বারান্দা। শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই বারান্দা, সকাল দুপুর
বিকেলভরে দেখতাম রাস্তায় কতরকম লোকের চলাফেরা। দুপুরে যেত ঠেলা
গাড়িতে রঙবেরঙের জিনিস নিয়ে ফেরিওয়ালা—‘জার্মান ওয়ালা দোআনা,
জাপান ওয়ালা দোআনা’। সপ্তাহে দু’দিন না তিনদিন যেত মিসেস উডের
বাক্সওয়ালা। বারান্দা থেকে মা-মাসি ডাক দিতেন ‘এই বাক্সওয়ালা, এখানে
এস’। মনটা নেচে উঠত, কারণ বিকেলের খাওয়াটা জমবে ভাল; বাক্সে আছে
মেমসাহেবের তৈরি কেক, পেন্টি, প্যাটি।

সক্ষে যখন হব-হব, তখন শোবার যেত সুর করে গাওয়া ‘ম্যায় লাহু মজেদা-র,
চানাচো-র গরম’; আর কিছু পরেই শুর হয়ে যেত রাস্তার ওপারে চাঁচুজ্যেদের বাড়ি
থেকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে কর্কশ গলায় কালোয়াতি গানের রেওয়াজ।

গ্রীষ্মাকালের দুপুরে যখন শোবার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়া হত,
তখনও কেমন করে জানি খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো আসার দরুন দিনের একটা
বিশেষ সময় রাস্তার উল্টো ছবি পড়ত জানালার বিপরীত দিকের দেওয়ালের
অনেকখনি জায়গা জুড়ে। বন্ধ ঘরে ম্যাজিকের মতো রাস্তার লোক চলাচল দেখা



যেত, গাড়ি রিক্সা সাইকেল পথচারী সব কিছু দিবি বোৰা যেত ওই ছবিতে। কতদিন যে দুপুরে শুয়ে শুয়ে এই বিনে পয়সার বায়ক্ষোপ দেখেছি তার ঠিক নেই।

আমাদের বাড়ির সদর দরজায় একটা ছোট ফুটো ছিল। দরজা বন্ধ করে সেই ফুটোর সামনে ঘষা কাচ ধরলেও বাইরের দৃশ্য খুদে আকারে উল্টো করে সেই কাচের উপর স্পষ্ট দেখা যেত। এটা নতুন কিছু নয়। এটাই হল ফোটোগ্রাফির গোড়ার কথা, আর এটা যে-কেউ নিজের বাড়িতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। কিন্তু তখন অজান্তে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে ভাবি অবাক লেগেছিল।

যে-মামার বাড়িতে উঠেছিলাম তিনি হলেন আমার সোনামামা। মামারা ছিলেন চার ভাই, তিনি বোন। ছোটমামা আমার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন। বড় আর মেজোমামা ছিলেন পাটনা আর লখনৌ-এর ব্যারিস্টার। তৃতীয় মামা ছিলেন সোনামামা। ইনি বিলেত যাননি, আর এর মধ্যে সাহেবিয়ানার লেশমাত্র ছিল না। আমারই এক মেসোমশাই ছিলেন এক ইনশিওরেন্স কোম্পানির মালিক, তখনকার দিনে বাঙালীদের এক জাঁদরেল কোম্পানি, সেই কোম্পানিতে কাজ করতেন সোনামামা।

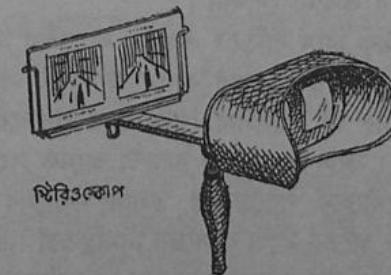
সোনামামার অক্ষের মাথা ছিল অসন্তুষ্ট পরিক্ষার। মনে আছে পরে যখন ইস্কুলে ভর্তি হই, আমার অ্যানুয়োল পরীক্ষার অক্ষের প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সিডিভাঙ্গার অঙ্কটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, ‘এটার উত্তর তো আট, তাই না?’ আমার কাছে জিনিসটা ভেলকির মতো মনে হয়েছিল।

এমনিতে গভীর মেজাজের লোক হলেও সোনামামার একটা ছেলেমানুষী দিক ছিল। মামার বয়স যখন ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু সমবয়সী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে তখনও রবিবার সকালে তুমুল উৎসাহে খেলা চলেছে ক্যারাম আর লুডো। পরে

এল ব্যাগাটেল ; তাতেও উৎসাহের কমতি নেই। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আর মাঝে মাঝে শুনতে হত—‘উঁহ, বড়দের মধ্যে থেক না মানিক’। আমি বেরিয়ে আসতাম ঠিকই, কিন্তু এটাও মনে হত যে মামারা যে কাজটা করছেন সেটাকে ঠিক বড়দের মানানসই কাজ বলা চলে না।

আসলে আমার অনেকটা সময় একাই কাটাতে হত ; বিশেষ করে দুপুর বেলাটা। কিন্তু তাতে আমার কোনোদিন একথেঁয়ে লেগেছে বলে মনে পড়ে না। দশ খণ্ডের বুক অফ নলেজের পাতা উলটিয়ে ছবি দেখা ছিল এই অবসর সময়ের একটা কাজ। এ বইগুলো কখনো পুরানো হয়নি। পরে মা কিনে দিয়েছিলেন চার খণ্ডে রোম্যান্স অফ ফেমাস লাইভ্স। ছবিতে বোঝাই বিখ্যাত বিদেশী লোকদের জীবনী।

বই ছাড়াও সময় কাটানোর জন্য ছিল একটা আশ্চর্য যন্ত্র। সেটার নাম স্টিরিওস্কোপ। তখন অনেকের বাড়িতেই এ জিনিসটা দেখা যেত, আজকাল আর যায় না। ভিকটেরীয় যুগের আবিক্ষার এই যন্ত্র। তলায় একটা হাতল, সেটা ধরে ফ্রেমে আঁটা জোড়া আতস কাচ দুই চোখের সামনে ধরতে হয়। কাচের সামনে হোল্ডারে দাঁড় করানো থাকে ছবি। একটি ছবি নয় ; লম্বা কার্ডে পাশাপাশি দুটো ফোটোগ্রাফ। দেখলে মনে হবে একই ছবি, কিন্তু আসলে তা নয়। দৃশ্য একই, কিন্তু সেটা তোলা হয়েছে এমন ক্যামেরা দিয়ে যার সামনে একটার বদলে দুটো লেন্স—যেন মানুষের দুটো চোখ। বাঁদিকের লেন্স তুলছে বাঁ চোখ যা দেখে তাই, আর ডান দিকটা তুলছে ডান চোখের দৃষ্টি দিয়ে। জোড়া কাচের ভিতর দিয়ে যখন দেখা যায়, তখন দুটো ছবি মিলে একটা হয়ে যায়, আর মনে হয় যেন জীবন্ত দৃশ্য দেখছি। স্টিরিওস্কোপের সঙ্গে ছবিও কিনতে পাওয়া যেত নানা দেশের নানা রকমের।



স্টিরিওস্কোপ

আরেকটা খেলার যন্ত্র ছিল আমার, সেটাও আৱ আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না। সেটা হল ম্যাজিক ল্যান্টার্ন। বাক্সের মতো দেখতে, সামনে চোঙার মধ্যে লেন্স, মাথার উপর চিমনি আৱ ডান পাশে একটা হাতল। তাছাড়া আছে দুটো রীল, একটায় ফিল্ম ভৰতে হয়, সেই ফিল্ম হাতল ঘোৱালে অন্য রীলে গিয়ে জমা হয়। ফিল্মটা চলে লেন্সের ঠিক পিছন দিয়ে। বাক্সের ভিতৰ জুলে কেৱলসিনেৱ বাতি, তাৱ ধৌঁয়া বেৱিয়ে যায় চিমনি দিয়ে, আৱ তাৱ আলো ঘুৱন্ত ফিল্মেৱ চলন্ত ছবি ফেলে দেয়ালেৱ উপৰ। কে জানে, আমার ফিল্মেৱ নেশা হয়ত এই ম্যাজিক ল্যান্টার্নেই শুক।

মামাৱ খেলার সাথীদেৱ মধ্যে ছিলেন আৱেক মামা, যিনি আমাদেৱ বাড়িতেই থাকতেন এক তলার পুবদিকেৱ ঘৰে। আসলে ইনি আঢ়ীয় নন। ঢাকায় মামাৰাড়িৱ পাশেই ছিল ঠিঁদেৱ বাড়ি। সেই সুত্রে বন্ধু, আৱ তাই আমি বলি মামা। কালুমামা। কলকাতায় এসেছিলেন চাকৱিৱ খোঁজে। চাকৱি পাবাৱ কিছু নাম নাম। কালুমামা। কলকাতায় এসেছিলেন ত্ৰিশ টাকা দামেৱ একটা ঝক্কাকে নতুন র্যালে দিনেৱ মধ্যে কিনে আনলেন ত্ৰিশ টাকা দামেৱ একটা ঝক্কাকে নতুনেৱ মতোই সাইকেল। ছ'মাস ব্যবহাৱেৱ পৱেও এই সাইকেল ছিল ঠিক নতুনেৱ মতোই ঝক্কাকে, কাৱণ রোজ সকালে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধৰে কালুমামা সাইকেলেৱ পৰিচ্যাৰ কৰতেন।

সোনামামা আমুদে লোক ছিলেন বলেই বকুলবাগানে এসে মাঝে মাঝে বায়ক্ষোপ, সার্কাস, ম্যাজিক, কাৰ্নিভ্যাল ইত্যাদি দেখাৱ সুযোগ আসত। একবাৱ এম্পায়াৱ থিয়েটাৱে (যেটা এখন রঞ্জি) এক সাহেবেৱ ম্যাজিক দেখতে গেলাম। নাম শেফালো। খেলাৱ পৰ খেলা দেখিয়ে চলেছেন, আৱ তাৱ সঙ্গে কথাৱ ফোয়াৱা ছুটছে। পৱে জেনেছিলাম জাদুকৱেৱ এই বুকনিকে বলা হয় ‘প্যাটার’। এই প্যাটারেৱ গুণে দৰ্শকেৱ দৃষ্টি চলে যায় জাদুকৱেৱ মুখেৱ দিকে, আৱ তাৱ ফলে হাতেৱ অনেক কাৱসাজি দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু শেফালোৱ দলে ছিলেন এক জাদুকৱী, নাম মাদাম প্যালাৰ্মো। তিনি ম্যাজিক দেখালেন একেবাৱে বোৱা সেজে। এ জিনিস আৱ কথনো দেখিনি।

এৱ কিছুদিন পৱে এক বিয়ে বাড়িতে একজন বাঙালীৱ ম্যাজিক দেখেছিলাম যাব কাছে শেফালো সাহেবেৱ স্টেজেৱ কাৱসাজি কিছুই না। স্টেজ ম্যাজিকে নানান যন্ত্ৰপাতিৱ ব্যবহাৱ হয়, আলোৱ খেলা আৱ প্যাটারেৱ জোৱে লোকেৱ চোখ মন ধৰিয়ে যায়। ফলে জাদুকৱেৱ কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই ভদ্ৰলোক ম্যাজিক দেখালেন প্যান্ডেলেৱ তলায় ফৰাসেৱ উপৰ বসে, তাঁৰ চাৱদিক ঘিৱে চাৱ পাঁচ হাতেৱ মধ্যে বসেছেন নিমন্ত্ৰিতৱা। এই অবস্থাতে একটাৱ পৰ একটা এমন খেলা দেখিয়ে গেলেন ভদ্ৰলোক যা ভাৱলে আজও তাজৰ বনে যেতে হয়। এই জাদুকৱকে অনেক পৱে আমাৱ একটা ছোট গল্পে ব্যবহাৱ

কৰেছিলাম। ফৰাসেৱ উপৰ দেশলাইয়েৱ কাঠি ছড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্ৰলোক, নিজেৱ সামনে রেখেছেন একটা খালি দেশলাইয়েৱ বাক্স। তাৱপৰ ‘তোৱা আয় একে একে’ বলে ডাক দিতেই কাঠিগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে বাক্সয় চুকছে। আমাদেৱই চেনা এক ভদ্ৰলোকেৱ কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটা কুপোৱ টাকা, আৱ আৱেকজনেৱ কাছ থেকে একটা আংটি। প্ৰথমটাকে রাখলেন হাত চাৱেক দূৱে, আৱ দ্বিতীয়টাকে নিজেৱ সামনে। তাৱপৰ আংটিটাকে উদ্দেশ কৰে বললেন, ‘যা, টাকাটাকে নিয়ে আয়।’ বাধ্য আংটি গড়িয়ে গেল টাকার কাছে, তাৱপৰ দুটো একসঙ্গে গড়িয়ে এল ভদ্ৰলোকেৱ কাছে। আৱেকটা ম্যাজিকে এক ভদ্ৰলোকেৱ হাতে এক প্যাকেট তাস ধৰিয়ে দিয়ে আৱেকজনেৱ হাত থেকে লাঠি নিয়ে ডগাটা বাড়িয়ে দিলেন তাৰেৱ দিকে। তাৱপৰ বললেন, ‘আয়ৱে ইঞ্চাপনেৱ টেক্কা।’ প্যাকেট থেকে সড়াং কৰে ইঞ্চাপনেৱ টেক্কাটা বেৱিয়ে এসে লাঠিৰ ডগায় আঁটকে থৰথাৱ কৰে কাঁপতে লাগল।

ম্যাজিক দেখাৱ কয়েকদিন পৱে হঠাৎ জাদুকৱেৱ সঙ্গে দেখা বকুলবাগান আৱ শ্যামানন্দ রোডেৱ মোড়ে। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চাশ, পৱনে ধূতি আৱ শার্ট, দেখলে কে বলবে ভদ্ৰলোকেৱ এত ক্ষমতা। আমাৱ ম্যাজিকেৱ ভীষণ শখ, মনে মনে আমি তাঁৰ শিষ্য হয়ে গৈছি। ভদ্ৰলোককে বললাম আমি তাঁৰ কাছে ম্যাজিক শিখতে চাই। ‘নিশ্চয়ই শিখবে’ বলে ভদ্ৰলোক তাঁৰ পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার কৰে রাস্তায় দাঁড়িয়েই আমাকে একটা খুব মাঝুলি ম্যাজিক শিখিয়ে দিলেন। তাৱপৰ আৱ ভদ্ৰলোকেৱ সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ সামনে পড়ে ঘাবড়ে গিয়ে ঊৱে ঠিকানাটাৱ নেওয়া হয়নি। পৱে ম্যাজিকেৱ বই কিনে হাত সাফাইয়েৱ অনেক ম্যাজিক আয়নাৱ সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই অভ্যোস কৰে শিখেছিলাম। কলেজ অবধি ম্যাজিকেৱ নেশাটা ছিল।

সার্কাস তো এখনও প্ৰতি বছৰই আসে, যদিও তখনকাৱ দিনে হার্মস্টোন সার্কাসে সাহেবোৱা খেলা দেখাত, আৱ আজকাল বেশিৱ ভাগই মাদ্রাজী সার্কাস। যেটা আজকাল দেখা যায় না সেটা হল কাৰ্নিভ্যাল। আমাদেৱ ছেলেবেলায় সেন্ট্ৰাল অ্যাভিনিউ-এৱ দুধাৱে ছিল বড় বড় মাঠ। কলকাতাৱ প্ৰথম ‘হাই-ৱাইজ’ দশ তলা টাওয়াৱ হাউস তখনও তৈৱি হয়নি, ইলেকট্ৰিক সাপ্লাই-এৱ ভিক্টোৱিয়া হাউস তৈৱি হয়নি। এই সব মাঠেৱ একটাতে সার্কাসেৱ কাছেই বসত কাৰ্নিভ্যাল।

কাৰ্নিভ্যালেৱ মজাটা যে কী সেটা আজকালকাৱ ছেলেমেয়েদেৱ বোঝানো মুশকিল। মেলায় নাগৱদোলা সকলেই দেখেছে, কিন্তু কাৰ্নিভ্যালেৱ নাগৱদোলা বা জায়ান্ট ছইল হত পাঁচ তলা বাড়িৰ সমান ঊঁচু। বহু দূৱে থেকে দেখা যেত ঘুৱন্ত ছইলেৱ আলো। এই নাগৱদোলা ছাড়া থাকত মেৰি-গো-ৱাউন,

এরোপ্লেনের ঘূর্ণি, খেলার মোটর গাড়িতে ঠোকাঠুকি, ঢেউখেলানো আলপাইন রেলওয়ে, আর আরো কত কী। এসবেরই চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত নানা রকম জুয়ার স্টল। এত লোভনীয় সব জিনিস সাজানো থাকত এই সব স্টলে যে খেলার লোভ সামলানো কঠিন হত। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে জুয়া খেলাটা সরকার বেতাইনী করে দেওয়ার ফলে কলকাতা শহর থেকে কর্নিভ্যাল উঠে গেল। আসল রোজগারটা হত বোধহয় এই জুয়া থেকেই।

ভবনীপুরে যখন প্রথম আসি তখনও ফিল্মে কথা আসেনি। তখনকার বিলিতি হাউসগুলোতে ছবির সঙ্গে কথার বদলে শোনা যেত সাহেবের বাজানো পিয়ানো বা সিনেমা অর্গান। এই সিনেমা অর্গান জিনিসটা কলকাতায় মাত্র একটা থিয়েটারেই ছিল। সেটা হল ম্যাডান, বা প্যালেস অফ ভ্যারাইটিজ। আজকাল এর নাম হয়েছে এলিট সিনেমা। অর্গানের নাম ছিল Wurlitzer, আর তার আওয়াজ ছিল ভারী জমকালো। যে সাহেব এই যন্ত্রটি বাজাতেন তাঁর নাম ছিল বায়বন হপার। রোজ কাগজে দেওয়া থাকত হপার সাহেব সেদিনের ছবির সঙ্গে কী কী সংগীত বাজাবেন তার তালিকা।

এই সময় দেখা ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে আছে Ben Hur, Count of Monte Cristo, Thief of Bagdad আর Uncle Tom's Cabin। প্রোবে তখন ছবির সঙ্গে স্টেজে নাচ-গানের বন্দোবস্ত ছিল। আজকাল যেমন সিনেমা থিয়েটারে গিয়ে দেখা যায় কাপড়ের পর্দা ঝুলছে, তখন তা ছাড়া আরেকটা বাড়িতি পর্দা থাকত। বিজ্ঞাপনে ভৱা এই পর্দাকে বলত সেফ্টি কার্টেন। সবচেয়ে প্রথমে উঠত এই পর্দা, তার কিছুক্ষণ পরে কাপড়ের পর্দা। প্রোবে কাপড়ের পর্দা উঠলে পরে বেরিয়ে পড়ত স্টেজ। তাতে রঙতামাশা শেষ হলে পর নেমে আসত সিনেমার সাদা ক্রীন। তারপর ছবি শুরু। পর্দার সামনে এক পাশে থাকত পিয়ানো। ছবির ঘটনার মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে সাহেব বাজনা চালিয়ে যেতেন যতক্ষণ ফিল্ম চলে।

Uncle Tom's Cabin ছবি দেখতে গিয়ে এক মজা হল। বাড়ির সবাই মিলে গিয়েছি প্লোব সিনেমায়। নিশ্চো দাস আংকল টম তার নৃশংস মনিব সাইমন লেগীর চাবুক খেয়ে দোতলার সিডি থেকে গড়িয়ে পড়ে মরে গেছে। আমাদের সকলের রাগ পড়ে আছে লেগীর উপর। ছবির শেষ দিকে টম ভূত হয়ে ফিরে আসে মনিবের কাছে। মনিব সেই ভূতের দিকেই চাবুক চালায়, টম হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে তার দিকে। কালুমামা আমার পাশে বসে হাঁ করে ছবি দেখতে দেখতে হাঠাঁ আর থাকতে না পেরে হল-ভূতি লোকের মধ্যে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার শুরু করে দিলেন—‘হালায় এহনো চাবুক মারে ?

এহনো চাবুক মারে ? শয়তান !—এইবার বুঝবি তর পাপের ফল !’

১৯২৮ সালে হলিউডে প্রথম সবাক ছবি তৈরি হল। কলকাতায় প্রথম টকি এল তার এক বছর পরেই। তার পরেও বছর খানেক ধরে এমন বেশ কিছু ছবি এসেছে যেগুলোর কিছু অংশে শব্দ আছে, কিন্তুতে নেই। যার পুরোটাতে শব্দ আছে কাগজে সেটার বিজ্ঞাপন হত ‘100% Talkie’ বলে। আমার দেখা প্রথম টকি সম্ভবত ‘টার্জন দি এপ্ম্যান’। প্লোবে এসেছে ছবি, প্রথম দিন দেখতে গিয়ে টিকিট পাওয়া গেল না। আমায় নিয়ে গেছেন আমার এক মামা। আমার মুখ দেখে তাঁর বোধহয় দয়া হল, বুঝলেন আজ একটা কিছু না দেখে বাড়ি ফেরা উচিত হবে না।

কাছেই ছিল অলবিয়ন থিয়েটার, যেটার নাম এখন রিগ্যাল। সেখানে টিকিট ছিল, কিন্তু সেটা বাংলা ছবি, আর মোটাই সবাক নয়। ছবির নাম ‘কাল পরিণয়’। সেটা যে ছোটদের উপযোগী নয়, সেটা আমিও খানিকটা দেখেই বুঝেছিলাম। মামা আমার দিকে ফিরে চাপা গলায় বার কয়েক জিগ্যেস করলেন ‘বাড়ি যাবে ?’ আমি সে-প্রশ্নে কানই দিলাম না। একবার যখন চুকেছি তখন কি আর পুরোটা না দেখে বেরোনো যায় ? অবিশ্যি এই ‘কাল পরিণয়’ দেখে আমার মনে একটা নাক-সিটকোন ভাব জেগেছিল যেটা বহুকাল আমাকে বাংলা ছবির দিকে যেঁবতে দেয়নি।

যে মামার সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম তিনি ছিলেন লেবুমামা। মা’র মাসতুতো ভাই। কালুমামার মতো ইনিও ঢাকা থেকে এসেছিলেন কলকাতায় চাকরির খৌঁজে। এঁরও স্থান হয়েছিল আমার মামার বাড়িতেই। এখানে মা’র আরেক মাসতুতো ভাইয়ের কথা বলা দরকার, কারণ ননীমামার মতো ঠিক আরেকটি লোক আমি বেশি দেখিনি। ছ’ফুট লম্বা, তীরের মতো সোজা, পরনে মালকোঁচা মারা খাটো ধূতি আর থ্রী-কোয়ার্টারি হাতা খাটো খদরের পাঞ্জাবি। ইনি হাঁটতেন হলহনিয়ে একেবারে মিলিটারি মেজাজে আর বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন ভয়ংকর চেঁচিয়ে। যারা গাঁয়েদেশে মানুষ হয় তাদের স্বভাবতই মাঠেঘাটে গলা ছেড়ে কথা বলতে হয়। সেই অভাসটাই হয়ত বেশি বয়সে শহরে এসেও থেকে যায়। তবে, চেঁচিয়ে কথা বললেও ননীমামার কথার মধ্যে একটা মেয়েলি টান ছিল। আর তিনি কাজের মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু যে কাজগুলো সত্যিই ভালো করতেন সেগুলো সবই মেয়েলি কাজ। বিয়ে করেননি। যদি করতেন তবে গিন্নীপনাতে মামাকে হরি মানাতে পারে এমন মেয়ে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। মামা সেলাই এবং রান্না দুটোতেই ছিলেন ওস্তাদ। পরের দিকে চামড়ার কাজ শিখে তার উপর একটা বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। ‘বাঙালীর মিষ্টি’ বলে একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা বেরোল না কেন

জানি না।

এই ননীমামার কাছ থেকেই চামড়ার কাজ শিখে মা নিজেও ক্রমে একজন এক্সপার্ট হয়ে উঠেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন মা সারা দুপুর বসে ওই কাজই করতেন। চামড়ায় যে রং লাগে তার সঙ্গে স্পিরিট মেশাতে হয়; সেই স্পিরিটের গান্ধে সারাক্ষণ ঘর ভরে থাকত। পরিপাটি হাতে তৈরি ব্যাগ, বটুয়া, চশমার কেস ইত্যাদি মা কিছু বিক্রীও করেছিলেন। এরও পরে মা মাটির মৃত্তি গড়ার কাজ শিখেছিলেন তখনকার নামকরা মৃৎশিল্পী নিতাই পালের কাছে। মা'র তৈরি বুদ্ধি আর প্রজ্ঞাপারমিতার মৃত্তি এখনও আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আছে।

এসব বিশেষ ধরনের কাজ ছাড়া একজন সুগঢ়িগী যেসব কাজ ভালো করেন সেগুলো তো মা করতেনই। সেই সঙ্গে মা'র হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত পরিপাটি। যেমন বাংলা তেমন ইংরিজি।

সোনামামার তখন আসকিন সিডান গাড়ি হয়েছে, যার নাম এই ফিয়াট-অ্যান্সারডেরের যুগে আর প্রায় কেউই জানে না। এই গাড়িতে করে বিকেলে মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতাম। তখন গড়ের মাঠে সাহেবেরা গল্ফ খেলত, তাই নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াবার উপায় ছিল না। কোন্ সময় কোন্ দিক থেকে যে বল ধেয়ে আসবে বুলেটের মতো তা বলা যেত না। একবার একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, দেখতে পাইনি যে একটা বল স্টান আসছে আমারই দিকে। ড্রাইভার সুধীরবাবু হঠাত হাঁচকা টান মেরে আমাকে সরিয়ে নিলেন, আর বল আমাদের দুজনের কান ধেঁষে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের রেলিং-এর দিকে।

সুধীরবাবু থাকতেন আমাদের বাড়ির ছাতের ঘরে। তখন মহাআ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। হঠাত একদিন এক ঢাউস তকলি আর একতাল তুলো কিনে এনে তাঁর ঘরে বসে সুতো কাটা শুরু করে দিলেন। এটাও অবিশ্বিয়। আন্দোলনেরই একটা অংশ। তার অল্পদিনের মধ্যেই ছোঁয়াচে ব্যারামের মতো ঘরে ঘরে সুতো কাটা আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতেও সকলের জন্যই একটা করে তকলি চলে এল, এমনকি আমারও। মাস খানেকের মধ্যেই দেখলাম আমিও দিবিয় সুতো কাটতে পারছি। তবে সুধীরবাবুই চ্যাম্পিয়ন হলেন। নিজের কাটা সুতো দিয়ে ফতুয়া বানাতে আর কেউ পারেনি।

কলকাতায় তখন এক বিরাট স্বদেশী মেলা হয়েছিল, আমরা সবাই দেখতে গিয়েছিলাম। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে তখন একটা প্রকাণ্ড খোলা মাঠ ছিল, তাকে বলত জিমখানা ফ্লাবের মাঠ। এখন সেখানে বাড়ি উঠে গেছে। সেই

যখন ছোট ছিলাম



মাঠে বসেছিল স্বদেশী মেলা। মেলার সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস ছিল দেশনেতাদের মোমের মৃত্তি। এই মৃত্তির বিশেষত্ব ছিল এই যে এগুলোর হাত পা মাথা যত্নের সাহায্যে নড়াচড়া করত। পার্টিশন দেওয়া পর পর ঘরে আলাদা আলাদা দৃশ্য। একটা ঘরে মহাআ গান্ধী জেলের কামরায় মাটিতে বসে লিখছেন, দরজার বাইরে সশন্ত প্রহরী। মহাআজীর হাতে কলম, কোলের উপর প্যাড। প্যাডের হাত লেখার ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চলছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও এদিক ওদিক ঘুরছে। আরেকটা ঘরে ভারতমাতার বিরাট মৃত্তি, তিনি দুহাতে বহন করছেন দেশবন্ধুর মৃতদেহ। ভারতমাতা দেশবন্ধুর দিকে চেয়ে দেখছেন, পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে বিষণ্ণভাবে মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। কে তৈরি করেছিল এই মোমের মৃত্তি তা মনে নেই—সম্ভবত বস্ত্রের কোনো শিল্পী—তবে দেখে সত্যই জীবন্ত বলে মনে হত। কলকাতা শহরে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই মৃত্তি নিয়ে।

আমার দিদিমা আমাদের সঙ্গে বকুলবাগানেই থাকতেন। ফরসা, ছিপছিপে, সুন্দরী ছিলেন দিদিমা। চমৎকার গানের গলা ছিল। তাঁর মুখে শোনা ময়মনসিংহের গান ‘চরকার নাচন দেইখ্যা যালো তরা’ এখনো কানে লেগে আছে। সালটা বোধহয় ১৯২৬; এমন সময় একবার আমার সব মামা মাসি তাঁর স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে মিলে একসঙ্গে এলেন কলকাতায়। এ ঘটনা বড় একটা ঘটে না। মেজোমামা থাকেন লখনৌ-এ, বড়মামা পাটনায়, বড়মাসি পূর্ববঙ্গে কাকিনায়; মেসো কাকিনা এস্টেটের ম্যানেজার।

সবাই কলকাতা আসাতে ঠিক হল দিদিমার সঙ্গে গুপ্ত ফোটো তোলা হবে। তখনকার দিনে অনেকের বাড়িতেই ক্যামেরা থাকত না; বা থাকলেও, সেটা হত চার-পাঁচ টাকা। দামের বক্স ক্যামেরা; তাই দিয়ে তেমন ভালো ছবি উঠত না, বাঁধিয়ে রাখার মতো গুপ্ত ছবি তো নয়ই। তাই কোনো বিশেষ উপলক্ষে সাহেব

দোকানে গিয়ে গুপ্ত ছবি তোলানোর রেওয়াজ ছিল। বাঙালী দোকানও যে ছিল না তা নয়, তবে তার বেশির ভাগই উভর কলকাতায়। সাহেব দোকানের মধ্যে এককালে দুটি ছিল কলকাতার সবচেয়ে নাম করা—বোর্ন অ্যান্ড শ্যেপার্ড আর জনস্টন অ্যান্ড হফ্ম্যান। তখন এই দুটো দোকানের বয়স প্রায় সত্তর বছর, আর অবস্থাও আগের মতো নেই। তার জায়গায় নাম করেছে হালের কোম্পানি এডনা লরেঞ্জ। এদের দোকান হল চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে চৌরঙ্গী ম্যানসনে। আমরা দিদিমা মা মামা মাসিমা মামী মেসো মামাতো ভাই-বোন সবশুন্দ আঠারো জন গিয়ে হাজির হলাম এডনা লরেঞ্জের দোকানে।

আগে থেকে বলা ছিল, তাই সাহেব গুপ্ত ছবি তোলার সব আয়োজন করেই রেখেছিল। প্রকাণ্ড হলঘরে পাশাপাশি চেয়ার রাখা হয়েছিল ছ'খানা। তারই মাঝামাঝি একটায় বসলেন দিদিমা। পুরুষরা সকলেই সার বেঁধে পিছনে দাঁড়াল, মা মাসি মামীরা বাকি চেয়ারগুলোয় বসলেন, বড়মামার অল্পবয়সী দুই মেয়ে বসল সামনে টুলে, আর আমি দাঁড়ালাম মা আর দিদিমার মাঝখানে। ঘরের মধ্যে ছবি তোলা হচ্ছে, ফ্ল্যাশ বা আলো ব্যবহার করবেন না সাহেবরা (হ্যাত তখন রেওয়াজও ছিল না), এক পাশে জানালার সারি দিয়ে যা আলো আসছে তাতেই হবে। ঢাউস ক্যামেরা, লেন্সের সামনে ক্যাপ বসানো, সেই ক্যাপ হ্যাত দু'সেকেন্ডের জন্য খুলে আবার বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর সেই দু'সেকেন্ডে ছবি উঠে যাবে। ওই সময়টুকুতে নড়াচড়া চলবে না।

সাহেব রেডি বলতে সবাই আড়ষ্ট হল, দৃষ্টি ক্যামেরার দিকে। যিনি ছবি তুলবেন, তাঁর পাশে আরেকজন সাহেব, তাঁর হাতে করতালওয়ালা সংপুত্তল, তার পেট টিপলে হাত দুটো খটাং খটাং করে করতাল বাজায়। এই পুতুলের দরকার আমার মেজোমামার ছোটছেলে বাচ্চুর জন্য। তার মাত্র কয়েক মাস বয়স, সে তার মায়ের কোলে বসেছে। তার দৃষ্টি যাতে ক্যামেরার দিকে থাকে, তাই সাহেব ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে করতাল বাজাতে শুরু করলেন, আর সময় বুঝে অন্য সাহেব লেন্সের ক্যাপ খুলে আবার বন্ধ করে ছবি তুলে নিলেন।

এই ছবি তোলার বছর চার পাঁচের মধ্যে আমার দিদিমা, বড়মামা আর বড়মাসির ছেলে মানুদা মারা যায়। এই একই গুপ্ত ফোটো থেকে এই তিন জনের ছবিই আলাদা আলাদা করে এন্লার্জ করে দেন আমার ধনদাদু।

বকুলবাগানে আমাদের সঙ্গে থাকতেন আমার ছোট মাসি। তাঁর গাইয়ে হিসেবে খুব নাম ছিল। অবিশ্বি ছোটমাসির গান আমরা যেমন শুনেছি, তেমন কোনো বাইরের লোকে কোনোদিন শোনেনি, কারণ লোকের সামনে গাইতে গেলেই ছোটমাসির গলা শুকিয়ে যেত।

একদিন শুনলাম ছোটমাসির গান বেরোবে হিজ মাস্টারস ভয়েস রেকর্ডে, আর সেই গান রেকর্ড করার জন্য ছোটমাসিকে যেতে হবে গ্রামফোন কোম্পানির আপিসে। ব্যবস্থাটা করেছেন বুলাকাকা। কলকাতার সবচেয়ে সন্তুষ্ট গ্রামফোনের দোকানের মালিক বলে বোধ হয় বুলাকাকার সঙ্গে গ্রামফোন কোম্পানির বেশ খাতির ছিল।

বুলাকাকার লাল রঙের টি-মডেল ফোর্ড গাড়িতে করে মাসির সঙ্গে আমিও গেলাম কোম্পানির আপিসে। আপিস তখন বেলেঘাটায়; দমদমে যায় আরো পরে। সাহেব কোম্পানিতে গিয়ে গান দিতে হবে বলে দু'দিন থেকে মাসির ঘুম খাওয়া বন্ধ। ক্রমাগত আশ্বাস দিয়ে চলেছেন বুলাকাকা—কিছু ভয় নেই, ব্যাপারটা খুব সোজা, সব ঠিক হয়ে যাবে। বুলাকাকা নিজে কোনোদিন গানটান শেখেনি, তবে বাঁশিতে রবিন্দ্রসংগীত বাজায়, আর দু'হাতে দাকুণ অ্যার্গান বাজায়।

সাহেব কোম্পানির সাহেব ম্যানেজার, সাহেব রেকর্ডিস্ট। তখনকার দিনে মাইক্রোফোন ছিল না; একটা চোঙার দিকে মুখ করে গান গাইতে হত, সেই গান পাশের ঘরে ছাপা হয়ে যেত ঘুরন্ত মোমের চাকতির উপর।

ছোটমাসি সকাল থেকে যে ক' গেলাস জল খেয়েছে তার হিসেব নেই। ওখানে গিয়ে চোঙার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে, আমি পাশের ঘরে কাচের জানালার পিছন থেকে ব্যাপারটা দেখছি। ছোকরা রেকর্ডিস্ট এসে চোঙাটাকে নেড়েচেড়ে মাসিকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর মাসির সামনেই প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ঠোঁট দিয়ে লুকে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুলাকাকা পরে বুঝেছিলেন কোনো মহিলা গাইয়ে এলেই নাকি রেকর্ডিস্ট তাঁদের দেখিয়ে দেখিয়ে এই ধরনের সব চালিয়াতি করেন। আমার বিশ্বাস সাহেবের সিগারেট জাগলিং দেখে মাসির গলা আরো শুকিয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, গান গাইলেন ছোটমাসি, শুনে বুঝতে পারছি আড়ষ্টভাব পুরো কাটেনি, তবে সেই গানই একদিন রেকর্ড হয়ে বাজারে বেরোল। তারপর অনেক দিন ধরে অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন ছোটমাসি। প্রথমে ছিলেন কনক দাশ; বিয়ের পর হলেন কনক বিশ্বাস।

বকুলবাগানে আমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ শ্যামানন্দ রোডে থাকতেন আমার মেজকাকা সুবিনয় রায়। এই কাকাই তখন একদিন নতুন করে বার করলেন সন্দেশ পত্রিকা। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে বাবা মারা যাবার পর বছর দুয়েকের মধ্যেই সন্দেশ উঠে যায়। তখনও আমার সন্দেশ পত্রার বয়স হ্যানি। টাট্কা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হাতে নিয়ে পত্রার অভিজ্ঞতা হল এই দ্বিতীয় পর্বে। মলাটে তিনরঙ্গ ছবি, হাতি দাঁড়িয়ে আছে দু'পায়ে, শুঁড়ে ব্যালাস করা সন্দেশের

হাঁড়ি । এই সন্দেশেই ধারাবাহিক ভাবে প্রথম সংখ্যা থেকে বেরোয় বৰীপ্রদ্বনাথের 'সে', আৰ এই সন্দেশেই প্ৰথম গল্প লিখলেন লীলা মজুব্বদার । ওনাৰ গল্পেৰ সঙ্গে মজাৰ ছবিগুলো উনি তখন নিজেই আঁকতেন । অন্য আঁকিয়েদেৱ মধ্যে ছিলেন এখনকাৰ নাম-কৰা শৈল চক্ৰবৰ্তী, যাঁৰ হাতেখড়ি সভ্বত হয় এই সন্দেশেই ।

আরেকটা ছেটদের বাংলা মাসিক পত্রিকা তখন বেরোত যেটা বেশ ভালো
লাগত, সেটা হল রামধনু। রামধনুর আপিস ছিল বকুলবাগান রোড আর
শ্যামানন্দ রোডের মোড়ে, আমাদের বাড়ি থেকে দুশ গজ দূরে। এই কাগজের
সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম, কারণ
ওর লেখা জাপানী গোয়েন্দা ছক্কাকাশির গল্প ‘পদ্মরাগ’ আর ‘যোষ চৌধুরীর ঘড়ি’
আমার দারুণ ভালো লেগেছিল।

ବକୁଳବାଗାନେ ଥାକତେଇ ପ୍ରଥମ ସାଁତାର ଶିଖିତେ ଯାଇ ପାଦପୁକୁରେ ଭବାନୀପୁର ସୁଇମିଂ
କ୍ଲାବେ । ତଥନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘୋଷ ସବେ ଗାୟେ ଚରି ମେଥେ ୭୬ ଘନ୍ଟା ଏକଟାନା ସାଁତାର କେଟେ
ଓୟଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ କରେଛେ, ଆର ପ୍ରାୟ ଏକଇ ସମୟ ଓୟଲର୍ଡ ଚାମ୍ପିଯନ ଆମେରିକାନ
ସାଁତାର ଜନି ଓୟାଇସମୁଲାର ଟାର୍ଜାନେର ଭୂମିକାଯ ଅଭିନ୍ୟ କରେ ଆମାଦେର ତାଙ୍କ
ଲାଗିଯେ ଦିଯେଛେ । ସୁଇମିଂ କ୍ଲାବେର ସରେ ଗିଯେ ଦେୟାଲେ ଓୟାଇସମୁଲାରେର ସହ କରା
ବାଁଧାନୋ ଛବି ଦେଖେ କ୍ଲାବ ସମ୍ପର୍କେ ଭକ୍ତି ବେଢ଼େ ଗିଯେଛିଲ । ରବିବାର ସକାଳଟା ବେଶ
କରେକ ବହର ବାଁଶ ଧରେ ଜଲେ ପା ଛୌଡ଼ା ଥେକେ ଆରଣ୍ୟ କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଁତାର ଦିଯେ
ଦିବି ପକ୍ରନ ଏପାର ଓପାର କରେ କେଟେଛେ ।

ছেলেবয়সে স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য ব্যায়ামের রেওয়াজটা আজকাল কতটা আছে জানি না, কিন্তু আমাদের সময় ছিল। সকালে ডন বৈঠক অনেকেই দিত। যারা শরীর নিয়ে একটু বেশি সচেতন তারা ডামবেল, চেস্ট এক্সপ্র্যাভারও বাদ দিত না। আমার নিজের ব্যায়ামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ ছিল না, কিন্তু ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের পাল্লায় পড়ে সেটা থেকে আর রেহাই পাইনি। ছোটদাদু নিজে দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গলে জরীপের কাজ করেছেন, দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের জীবন। পুরুষের মধ্যে মেয়েলিপনা তিনি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না; এমনকি রবীন্নাথের ঘাড় অবধিটেউ খেলানো চুলেও তাঁর আপত্তি। ছোটদাদুর অনেক ছেলে, সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়, সকলেই ব্যায়াম করে। আমি গিয়ে তাদের দল ভারী করলাম।

ব্যায়ামের কথাই যখন উঠল তখন এই ফৌকে আমার যুযুৎসু শেখার ঘটনাটাও বলে নিই, যদিও সেটা ঘটেছিল ১৯৩৪ সালে, যখন আমি বকুলবাগান ছেড়ে চলে গেছি বেলতলা রোডে।

যুবৃৎসু জিনিসটা প্রথম দেখি শাস্তিনিকেতনে। তখন আমার বছর দশকে
বয়স। গিয়েছিলাম শাস্তিনিকেতনে পৌষ মেলায়। নতুন অটোগ্রাফের খাতা

କିନ୍ତୁ, ଭୀଷମ ଶବ୍ଦ ତାର ପ୍ରଥମ ପାତାଯ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥକେ ଦିଯେ ଏକଟା କବିତା ଲିଖିଯେ ଗୋ ।

‘এক সকালে মা’র মঙ্গে গোলাম উত্তরায়ণে। খাতাটো দিতে রবীন্দ্রনাথ বললেন,
‘ট্রাং থাক আমার কাছে ; কাল সকালে এসে নিয়ে যেও।’

କଥା ମତୋ ଗେଲାମ ପରେର ଦିନ । ଟେବିଲେର ଉପର ଚିଠି-ପତ୍ର ଖାତା ବହିରେର ଡାଇ,
ତାର ପିଛନେ ବସେ ଆଛେନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଆର ଆମାୟ ଦେଖେଇ ଆମାର ଛୋଟ ବେଣୁନୀ
ଖାତଟା ଝୁଜିତେ ଲେଗେଛେ ସେଇ ଭୀଡ଼ର ମଧ୍ୟେ । ମିନିଟ ତିଲେକ ହାତଡ଼ାନୋର ପରେ
ବେରୋଲ ଖାତଟା । ଦେଟା ଆମାୟ ଦିଯେ ମା'ର ଦିକେ ଚେଯେ ବଲଲେନ, 'ଏଟାର ମାନେ ଓ
ଆରେକଟୁ ବଡ଼ ହଲେ ବୁଝବେ ।' ଖାତା ଖୁଲେ ପଡ଼େ ଦେଖି ଆଟ ଲାଇନେର କବିତା, ଯେଟା
ଆଜ ଅନେକରେଇ ଜାନା—

କରୁ ଦିନ ସିଂହ' କରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବେ
 କରୁ କୃପ କରୁ କାହାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବେ
 ଅଧିକ କରୁ ଗର୍ଜୁ ପଞ୍ଚତଥଳା
 କରୁ ମିଶିବେ ଶିଖିଛି ମିଶି
 ଦେଖୁ କୁପ ନାହିଁ କଥ୍ଯ ବାଲିପା
 ଏହି ହତେ ଶୁଣୁ ମୁହଁ ପାଇଲିପା
 ଏହାର ମାର୍ବଦ ଶିଖିବୁ ଉପାର୍ଥ
 ୧୯୫୩ ମେୟେ ଶିଖିବି ବିନ୍ଦୁ ॥
 ଶାକ୍ତିକିତନ
 ଶ୍ରୀରାଧିକ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର

সেইবারই দেখলাম যুৎসু বা জুদোর নমুনা। প্রাচীন যুগে চীনের বৌদ্ধ লামারা দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য হাতিয়ার ছাড়া লড়াই ও আঞ্চলিক কার এই কৌশলটা উন্নত করেছিল। চীন থেকে যায় জাপানে, তারপর জাপান থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এই জুদো। রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়ে জুদো দেখে ঠিক করেন শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের এই জিনিসটা শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই জুদো এক্সপার্ট তাকাগাকি চলে আসেন শাস্তিনিকেতনে, আর জুদোর ক্লাস শুরু হয়ে যায়। কী কারণে জানি না, এই ক্লাস বছর চারেকের বেশি চলেনি। শেষে তাকাগাকি শাস্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়, আর বালিগঞ্জের সুইনহো-স্ট্রাইটে আমারই এক মেসোমশাই ডাঃ অজিতমোহন

বোসের বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে সেখানে জুদো শেখানোর ব্যবস্থা করেন।
কথা নেই বার্তা নেই, ছোটকাকা সুবিমল রায় হঠাতে একদিন আমাদের বাড়ি
এসে বললেন, ‘জুদো শিখলে কেমন হয়?’

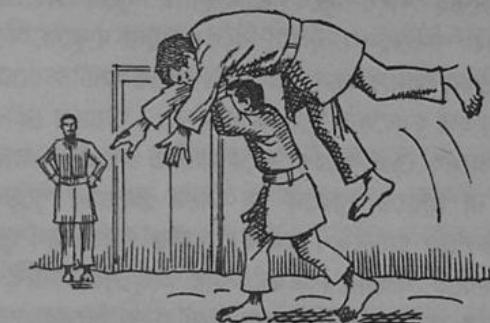
ছোটকাকাকে যারা দেখেছে তারাই জানবে যে ওর সঙ্গে ব্যায়াম বা কুস্তি বা
ওই জাতীয় কোনো কিছুর কোনোরকম সম্বন্ধ কল্পনা করা কত কঠিন। রোগা
পটকা আলাভোলা মানুষ, এম-এ পাশ করার পর থেকেই ইস্কুল মাস্টারি করছেন,
এমন লোকের যুবৎসু শেখার দরকারই বা হবে কেন বা এমন ইচ্ছে মাথায়
আসবেই বা কেন? কিন্তু সেই ইচ্ছেই একদিন দেখি ফলতে চলেছে, আর আমিও
চলেছি ছোটকাকার সঙ্গে ট্রামে বালিগঞ্জে সুইনহো স্ট্রীটে জাপানী জুদো-নবিশের
সঙ্গে কথা বলতে।

আজকের বালিগঞ্জ আর ১৯৩৪-এর বালিগঞ্জে যে কত তফাত সেটা যে না
দেখেছে তার পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে
মহানির্বাণ মঠ ছাড়াবার পর পাকা বাড়ি পায় চোখেই পড়ে না, আর রাস্তার
দু'পাশে আম জাম কঁঠাল আর ঝোপঝাড় মিলিয়ে পায় পাড়াগাঁয়ের চেহারা!

গড়িয়াহাটের ঘোড়ে নেমে ডোবা বাঁশবাড় তাল নারকেল ভরা মাঠ পেরিয়ে
তবে সুইনহো স্ট্রীট। বোধহয় টেলিফোনে আগে থেকে জানানো ছিল, তাই
মেশোমশাইদের বাড়ি খুঁজে বার করে একতলার বৈঠকখানায় বসে বেগুনী
কিমোনো পরা জুদো-এক্সপার্ট তাকাগাকির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নিতে
কোনো অসুবিধা হল না। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ চালিশ, কুচকুচে কালো
কদম্বাংট চুলের সঙ্গে মানানসই ঘন কালো ভূকু আর গৌঁফ। আমার ধারণা ছিল
ছোটকাকা জুদো শিখতে চান জেনে তাকাগাকি হ্যাত হেসেই ফেলবেন। কিন্তু
সেরকম কিছু তো করলেনই না, বরং ভাব দেখালেন যে জুদোর হ্যাত হিসেবে
ছোটকাকা একেবারে আইডিয়াল। কথাবার্তার পর দরজি এসে মাপ নিয়ে গেল
জুদোর জামার জন্য। খদ্দর টাইপের পুরু সাদা কাপড়ের তৈরি জ্যাকেট, বেল্ট
আর খাটো পায়জামা। জ্যাকেটের বুকের উপর কালো সুতোয় সেলাই করে বড়
বড় অক্ষরে লেখা JUDO।

জামা তৈরি হলে পর দশ ইঞ্চি পুরো গদি বিছানো ঘরে জুদো শেখা আবশ্য
হল। পাঁয়তালিশ বছর পরে জুদোর মাত্র দুটো প্যাচই এখনো মনে
আছে—শেওই-নাগে আর নিপ্পন-শিও। শেখার শুরুতে খালি আছাড় খাও আর
আছাড় মারো। চোট না পেয়ে কী করে আছাড় খেতে হয় এটা জুদোর একেবারে
গোড়ার শিক্ষা। তাকাগাকি বলে দিয়েছিলেন—যখন পড়বে তখন শরীরটাকে
একেবারে আলগা দিয়ে দেবে, তাহলে ব্যথা কম পাবে, আর হাড় ভাঙার
মস্তাবনাও কমে যাবে। আছাড় মানে একেবারে মাথার উপর তুলে আছাড়।

যখন ছোট ছিলাম



জুদোর কায়দায় একা বারো-তেরো বছরের ছেলেও যে একটা ধূমসো মানুষকে
কত সহজে আছাড় মারতে পারে, সে এক অবাক করা ব্যাপার।

আমরা যেদিন শিখতাম সেদিন আরো দৃঢ় ভদ্রলোক আসতেন—একজন
বাঙালী, একজন সাহেব। বাঙালীটি আমাদের মতো শিক্ষানবিশ, আর সাহেবটি
ছিলেন ফোর্ট উইলিয়মের অধিবাসী আর্মির লোক Captain Hughes। ইনি
বক্সিং-এ কলকাতার লাইটহেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা,
চোখাচোখা নাকমুখ, ছোট করে ছাঁটা টেউখেলানো সোনালি চুল। জুদোয় এর
শেখবার কিছু ছিল না। ইনি নিজেই ছিলেন একজন এক্সপার্ট। কলকাতায়
প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে ইনি তাকাগাকির সঙ্গে কিছুক্ষণ লড়ে নিজের বিদ্যেটা একটু
ঝালিয়ে নিতেন। সে লড়াই দেখবার জিনিস, আর আমরা দেখতাম মন্ত্রমুক্তের
মতো। প্যাঁচের পর প্যাঁচ, আছাড়ের পর আছাড়, আর যে-কোনো একজন
বেকাদায় পড়লেই ডান হাত দিয়ে গদির উপর পর পর দুটো চাপড় মেরে জানিয়ে
দেওয়া, আর অন্য জন তার প্যাঁচে আলগা দিয়ে তাকে রেহাই দেওয়া।

সবশেষে তাকাগাকি আমাদের খাওয়াতেন ওভালটিন, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে
জংলা মাঠ পেরিয়ে ভবানীপুরের ট্রাম ধরে আমরা আবার ফিরে যেতাম যে যার
বাড়ি

উন্নত কলকাতা থেকে দক্ষিণে চলে আসার ফলে বাপের দিকের
আঞ্চলিকস্বজনের সঙ্গে যোগ করে গেলেও, ধনদাদু আর ছোটকাকা প্রায়ই আসতেন
আমাদের বাড়ি। দাদু তখন কলান ডয়েলের গল্প উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ
করছেন। পোশাকে সাহেবী ভাব, বরকত আলির দোকান থেকে সুট করান,
বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোলে টাই পরে বেরোন। ট্রামের মান্থলি টিকিট আছে,
সপ্তাহে অস্তত তিনদিন আসেন আমাদের বাড়ি।

ভবানীপুরে থাকতেই দাদুর মুখে শুনেছিলাম পুরো মহাভারতের গল্প। এক-একদিন এক-এক পরিচ্ছেদ। একটা বিশেষ ঘটনা দাদুকে দিয়ে অস্তত বার চারেক বলিয়েছি। তখন আমার মনে হত মহাভারতের সেটা সবচেয়ে গায়ে-কাঁটা দেওয়া ঘটনা। সেটা হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথ বধ। জয়দ্রথ কৌরবদের দিকের বড় যোদ্ধা। অর্জুন অনেক চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারেনি। আজ সে প্রতিজ্ঞা করেছে জয়দ্রথকে না মারতে পারলে সে নিজে আগন্তে পুড়ে মরবে। এই প্রতিজ্ঞার কথা কৌরবরাও শুনেছে। যুদ্ধ হয় সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্য ডুবুডুব, তখনও পর্যন্ত অর্জুন কিছু করতে পারেনি। এমন সময় অর্জুনের সারথি কৃষ্ণ মন্ত্রবলে চারিদিক অঙ্কুরার করে সূর্যকে ঢেকে দিলেন। কৌরবরা দিনের শেষ ভোবে ঢিলে দিল আর সেই সুযোগে অর্জুন জয়দ্রথের মাথা উড়িয়ে দিল এক বাণে।

কিন্তু এখানেও মুশকিল। জয়দ্রথের বাবা রাজা বৃন্দক্ষত্র ছেলের জন্মের সময় দৈববাণী শুনেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর ছেলের মাথা কাটা যাবে। শুনে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন কাটা মুণ্ড মাটিতে পড়লেই, যে ফেলেছে তার নিজের মাথা চোচির হয়ে যাবে। এটা জানা ছিল বলে কৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—দেখো, জয়দ্রথের কাটা মাথা যেন মাটিতে না পড়ে; তাহলে তোমার মাথাও ফেটে যাবে। অর্জুন তাই এক বাণে জয়দ্রথের মাথা কেটে সেটা মাটিতে পড়ার আগেই পর পর আরো ছ'টি বাণ মেরে সেটা শূল্যে উড়িয়ে বহুদূর নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল জয়দ্রথের তপস্যারত বুড়ো বাপ বৃন্দক্ষত্রের কোলে। বৃন্দক্ষত্র নিজের ছেলের মাথা কোলে দেখেই চমকে উঠে দাঁড়ানোমাত্র কাটা মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মাথা ফেটে চোচির হয়ে গেল।

দাদুর কাছে যেমন মহাভারতের গল্প শুনতাম, তেমনি ছোটকাকার কাছে শুনতাম ভূতের গল্প। এই ছোটকাকার বিষয় অল্প কথায় বলা মুশকিল, কারণ ঠিক ছোটকাকার মতো আরেকটি মানুষ আর আছে কিনা সন্দেহ।

ছোটকাকা মাস্টারি করতেন সিটি স্কুলে। খাটো ধূতি, দেলা-হাতা পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, হাতে ছাতা আর পায়ে ব্রাউন ক্যান্সিসের জুতো দেখলে পেশাটা আন্দাজ করা যেত। ছোটকাকা বিয়ে করেননি। একা মানুষ বলেই বোধহয় ছোটকাকার কাজ ছিল হেঁটে বা বাসে পালা করে চতুর্দিকের আঞ্চলিক স্বজনের বাড়ি গিয়ে তাদের খবর নেওয়া। আমার বিশ্বাস আমাদের বিবাট ছড়ানো রায় পরিবারের সবাইকে একমাত্র ছোটকাকাই চিনতেন।

মজার মানুষের স্বপ্নগুলোও মজার হয় কিনা জানি না। ছোটকাকার স্বপ্নের কথা শুনে তাই মনে হত। একবার স্বপ্ন দেখলেন এক জায়গায় খুব জাঁকিয়ে কীর্তন হচ্ছে। কিছুক্ষণ শুনে বুঝলেন গানের কথা শুধু একটিমাত্র লাইন—‘সত্তা বেগুন জলে’। কী ভাবে এই লাইনটা গাওয়া হচ্ছিল সেটাও ছোটকাকা নিজে

গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আরেকটা স্বপ্নে দেখলেম কলকাতার রাস্তায় প্রোসেশন বেরিয়েছে। মানুষের নয়, বাঁদরের। তাদের হাতে ঝাঙা, আর তারা স্লোগান দিতে দিতে চলেছে—‘তেজ চাই! তেজ চাই! আফিঙে আরো তেজ চাই!’

আঞ্চলিকদের অনেককেই ছোটকাকা তাঁর নিজের দেওয়া নামে ডাকতেন। তাই শুধু না, তাদের বিষয় কিছু বলতে গেলেও সেই নামেই বলতেন। বার বার ছোটকাকার মুখে শুনে শুনে সে সব নাম আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। আমরা জানতাম ‘ডিডাক্স’ হচ্ছেন ধনদাদু; ‘Voroid’ হচ্ছেন মেজোপিসেমশাই, ‘ওয়্যাং’ হচ্ছে ধনদাদুর মেয়ে তুতুপিসি, ‘গোগ্রিল’ হচ্ছে ধনদাদুর ছেলে পানকুকাকা, ছোট ‘কুসুমপুয়া’ আর বড় ‘কুসুমপুয়া’ হল আমার পিসতুতো বোন নিনিদি আর রুবিদি, ‘বজ্র বৌঠান’ হচ্ছেন মা, ‘নুলমুলি’ হচ্ছি আমি। কখন কেন কীভাবে এই নামকরণ হয়েছে তা কেউ জানে না। একবার জিগ্যেস করছিলাম পিসেমশাইয়ের নাম Voroid হল কেন। তাতে ছোটকাকা গন্তব্যির ভাবে জবাব দিয়েছিলেন, ‘উনি খুব ভোরে ওঠেন তাই।’ নিজে বাড়াবাড়ি রকম ধার্মিক না হলেও, সাধু সন্ধ্যাসীদের সম্পর্কে ছোটকাকার একটা স্বাভাবিক কৌতুহল ছিল। তাঁদের জীবনী পড়তেন, আর জীবিতদের মধ্যে যাঁদের উপর ছোটকাকার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁরা শহরে এলেই তাঁদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসতেন। তিব্বতী বাবা, তৈলঙ্গ স্বামী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সন্দাম বাবাজী, রামদাম কাঠিয়া বাবা—এই সব সাধুদের সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনেছি ছোটকাকার কাছে।

একা মানুষ, নিজের ধান্দায় থাকেন, অল্পেই সন্তুষ্ট, তাই ছোটকাকাকেও মাঝে মাঝে এক রকম সন্ধ্যাসী বলেই মনে হত। তাছাড়া ওর কিছু বাতিক ছিল যেটা সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। মুখে প্রাস নিয়ে ব্রিশবার চিবোনোর কথাতো আগেই বলেছি; সকালে মুখ ধোবার সময় বেশ কিছুক্ষণ চলত নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে বারুকরা। এটার নাম ছিল নাকী মুদ্রা। এটা ছাড়া কাকী মুদ্রা বলেও একটা ব্যাপার ছিল, সেটা যে কী তা আর মনে নেই। বিকেলে শ্বাসন করে শুয়ে থাকতেন বেশ কিছুক্ষণ, আর তার পরেই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

খাওয়া, বিশ্রাম, কাজ, বেড়ানো, গল্প করা—সব কিছুরই ফাঁকে ফাঁকে চলত ছোটকাকার ডায়ারি লেখা। এটা জোর দিয়ে বলতে পারি যে এমন ডায়ারি কেউ কোনো দিন লেখেনি। এতে থাকত সকালে কাগজে পড়া জরুরী খবরের শিরোনাম থেকে শুরু করে প্রায় প্রতি ঘন্টায় কী করলেন, কী পড়লেন, কী খেলেন, কোথায় গেলেন, কী দেখলেন, কে এল—সব কিছুর বিবরণ। ট্রেনে করে বাইরে গেলে এনজিনের কী ‘টাইপ’ সেটাও লিখে রাখতেন। এনজিনের যে

শ্ৰেণীবিভাগ হয় সেটাুও ছোটকাকার কাছেই প্ৰথম জানি। XP, HPS, SB, HB—এসব হল টাইপের নাম। তখনকার দিনের কয়লার এনজিনের গায়েই সেটা লেখা থাকত। কোথাও যেতে হলে ছোটকাকা স্টেশনে হাজিৰ হতেন হাতে খানিকটা সময় নিয়ে, কাৰণ কামৰায় মাল তুলেই বট্ট কৰে গিয়ে এনজিনের টাইপ জেনে আসতে হৈব। যদি কোনো কাৰণে দেৱি হয়ে যেত, তাহলে প্ৰথম বড় জাংশন এলৈই কামৰা থেকে নেমে সে কাজটা সেৱে আসতেন।

এই ডায়াৰি লেখা হত চার রকম রঙেৰ কালিতে—লাল, নীল, সবুজ আৱ কালো। একই বাকো চার রকম রঙই ব্যবহাৰ হচ্ছে, এই নমুনা ছোটকাকার ডায়াৰিতে অনেক দেখেছি। এই রঙ বদলেৰ একটা নিয়ম ছিল, তবে সেটা কোনোদিনই আমাৰ কাছে খুব পৰিষ্কাৰ হয়নি। এইটুকু জানতাম যে প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা সবুজ কালিতে লেখা হবে, আৱ বিশেষ হলে তাতে লাল কালি ব্যবহাৰ হবে। যেমন, ‘আজ তুমুল বৃষ্টি। মানিকদেৱ বাড়ি ঘাওয়া হল না’—এই যদি হয় দুটো পৱ পৱ বাক্য, তাহলে প্ৰথমটা লেখা হবে সবুজ কালিতে, দ্বিতীয়টাৰ প্ৰথম দুটো কথা হবে লাল, আৱ বাকিটা কালো কিম্বা নীল। খাটোৱ উপৰ চৌকি, আৱ তাৱ উপৰে কালি কলমেৰ দোকান সাজিয়ে যখন ভীষণ মনোযোগ দিয়ে ছোটকাকা ডায়াৰি লিখতেন, তখন সেটা হত একটা দেখবাৰ মতো জিনিস।

এখানে ডায়াৰিৰ আৱেকটা জিনিসেৰ কথা না বললেই নয়।

ছোটকাকা পেটুক না হলেও, খেতেন খুব তৃপ্তি কৰে। রোজ এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে চা খাওয়াৰ ব্যাপারটা ছিল একটা বিশেষ ঘটনা। ডায়াৰিতে এৱ উল্লেখ থাকত, তবে মাঝুলিভাৱে নয়। যে চা-টা খেলেন তাৱ একটা বিশেষণ, আৱ ব্যাকেটেৰ মধ্যে সেই বিশেষণেৰ একটা ব্যাখ্যা চাই।

একমাসেৰ ডায়াৰি থেকে বারোটা উদাহৰণ দিচ্ছি। ব্যাপারটা পৰিষ্কাৰ হবে—

- ১) নৃসিংহভোগ্য চা (ভৈৱকাস্তি-জনক হৃষক প্ৰসাদক, জোৱালো চা)
- ২) বৈষ্ণবভোগ্য চা (নিৰীহ, সুমিষ্ট, সুকোমল, অহিংসক চা)
- ৩) বিবেকানন্দভোগ্য চা (কৰ্মযোগস্পৃহাবৰ্ধক, বাগবিভূতিপ্ৰদ, তত্ত্বনিষ্ঠাৰ অনুকূল উপাদেয় চা)
- ৪) ভট্টাচার্যভোগ্য চা (বিজ্ঞতাৰ্বৰ্ধক, গাঞ্জীৰপ্ৰদ, অনুগ্ৰা, হৃদয় চা)
- ৫) ধৰ্মস্তৱিভোগ্য চা (আৱোগাবৰ্ধক, আয়ুষ্য, রসায়নগুণ-সম্পন্ন চা)
- ৬) পাহাৰাদাৰভোগ্য চা (সতৰ্কতাৰ্বৰ্ধক, উত্তেজক, তন্দুনাশক চা)
- ৭) মজলিসী চা (মস্তুল-মস্তুল ভাবোদ্বেককৰী চা)
- ৮) কেৱানিভোগ্য চা (হিসাবেৰ খাতা দেখায় উৎসাহবৰ্ধক, বাদামী, স্বাদু চা)
- ৯) হাবিলদাৰভোগ্য চা (হিম্বৎপ্ৰদ, হামবড়াভাৱেৰ প্ৰৱৰ্তক চা)

- ১০) জনসাধাৰণভোগ্য চা (বৈশিষ্ট্যহীন, চলনসই চা)
- ১১) নারদভোগ্য চা (সঙ্গীতানুৱাগবৰ্ধক, তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰসাদক, ভক্তিৰসোদীপক চা)
- ১২) হনুমানভোগ্য চা (বিশ্বাসযোগ্যতাৰ্বৰ্ধক, সমস্যা-সমুদ্ৰলঙ্ঘনেৰ শক্তিদায়ক, বিক্ৰমপ্ৰদ চা)।



চুটিতে বাইরে

গড়পার থেকে ভবানীপুর আসার দু-এক বছরের মধ্যেই মা বিধবাদের ইঙ্গুল বিদ্যাসাগর বাণীভবনে চাকরি নেন। তার জন্য মা-কে বাসে করে রোজ সেই গড়পারেই কাছাকাছি যেতে হত। আমার পড়াশুনার ভারও তখন মায়েরই উপর; আমি ইঙ্গুলে ভর্তি হই ন'বছর বয়সে। গীঁয়ে আর পুজোয় মা'র যখন ছুটি হত, তখন আমরা দুজন মাঝে বাইরে যেতাম চেঞ্জে।

এর আগে গড়পারে থাকতে বাবা মারা যাবার পরও বারকয়েক বাইরে গেছি, তার মধ্যে দুবারের কথা অল্প অল্প মনে আছে।

একবার লখনো গিয়ে কিছুদিন মা'র মাসতুতো ভাই অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ি, আর কিছুদিন অতুলপ্রসাদের বোন ছুটিকি মাসির বাড়ি ছিলাম। অতুলমামার বাড়িতে খুব গান বাজনা হত সেটা মনে আছে। অতুলমামা নিজে গান লিখতেন, সে গান মাকে শিখিয়ে মা'র একটা কালো খাতায় লিখে দিতেন। তখন রবিশঙ্করের গুরু আলাউদ্দীন খাঁ অতুলমামার বাড়িতে ছিলেন আর মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজাতেন। একদিন এলেন তখনকার নামকরা গাইয়ে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার। তিনি গেয়ে শুনিয়েছিলেন বিখ্যাত ভৈরবী 'ভবানী দয়ানী' সেটা পরিকার মনে আছে। এই গান ভেঙে অতুলমামা লিখলেন 'শুন সে ডাকে আমারে'।

একদিন অতুলমামা আর মা'র সঙ্গে আমাকে যেতে হল এক বড়তা শুনতে। ওস্তাদী গানের বিষয় বড়তা, তার উপর আবার ইংরিজিতে। আমি বার বার ঘুমে ঢুলে পড়ছি, আর তারপর অভদ্রতা হচ্ছে বুঝতে পেরে (কিস্বা মায়ের ধরক খেয়ে) জোর করে সোজা হয়ে বসে চোখ খুলে রাখতে চেষ্টা করছি। তখন কি আর জানি যে যিনি বড়তা করছেন তাঁর নাম বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, আর তাঁর মতো সংগীত বিশারদ পঞ্চিত ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মেছে?

ছুটিকি মাসির বাড়িতে খুব একটা জন্মেনি এই কারণে যে মেসোমশাই শ্রীরঙ্গম দেশিকাচার শেষাদ্বি আয়াঙ্গার ছিলেন মাদ্রাজি, আর তাঁর তিনি ছেলেমেয়ে, আমার মাসতুতো ভাইবোন অমরদা, কুস্তদি আর রমলাদি, কেউই বাংলা বলত না বা জানত না। আমাকে তাই বেশির ভাগ সময়ই মুখ বন্ধ করে তাদের গড়গড় করে বলা ইংরিজি শুনতে হত। শুধু সঙ্গেবেলা 'হ্যাপি ফ্যামিলি' বলে একটা খেলা খেলার সময় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতাম।

সেবার লখনোতে ছেটমাসিও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। যাবার সময় না আসবার সময় মনে নেই, মা আর মাসি উঠে গেলেন ইন্টারেক্টিভ লেডিস

কামরায় ; আমার সেখানে জায়গা হল না বলে আমাকে কোনোরকমে উঠিয়ে দেওয়া হল পাশের এক সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। উঠে দেখি কামরা বোঝাই লালমুখো সাহেব মেম। আমার বুক ধুকপুক। মুখে রা নেই, উঠে পড়েছি, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, নামতেও পারি না। কী আর করি, একটা কোণে মেরোতে বসে রাইলাম চুপটি করে সারারাত। সাহেবরা যদি আমায় বসতে দিতে চেয়েও থাকে, তাদের ইংরিজি বোঝার সাধ্য ছিল না আমার। আমার ধারণা তারা আমাকে গ্রাহ্য করেনি।

লখনোতে পরেও গিয়েছি বেশ কয়েকবার। মেজোমামা ছিলেন ওখানকার ব্যারিস্টার। তাঁর দুই ছেলে মন্টু বাচু আমার চেয়ে বয়সে ছেট হলেও আমার খেলার সাথী। শহরটার উপরেও একটা টান পড়ে গিয়েছিল। নবাবদের শহরের বড়া ইমামবড়া, ছোটা ইমামবড়া, ছত্র মঞ্জিল, দিলখুশার বাগান—এসব যেন মনটাকে নিয়ে যেত আরব্যোপন্যাসের দেশে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত বড়া ইমামবড়ার ভিতরের গোলকধাঁধা ভুলভুলাইয়া। গাইড সঙ্গে না থাকলে ভিতরে ঢুকে আর বেরোন যায় না। গাইড গল্প করত একবার এক গোরা পশ্চন নাকি বড়াই করে একাই ঢুকেছিল গোলকধাঁধার ভিতরে। তারপর বাইরে বেরোবার পথ না পেয়ে সেখানেই থেকে যায়, আর না থেকে পেয়ে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। রেসিডেন্সির ভগ্নস্তুপের দেয়ালে কামানের গোলার গর্তে সিপাহী বিদ্রোহের চেহারাটা যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম। মার্বেলের ফলক বলছে—এই ঘরে অমুক দিন অমুক সময়ে কামানের গোলায় সার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু হয়। ইতিহাস ভেসে ওঠে চোখের সামনে। এই লখনোকে পরে আমি গল্পে আর ফিল্মে ব্যবহার করেছি। ছেলেবেলার স্মৃতি আমার কাজ অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল।

প্রথম লখনো যাবার পরেই মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম শাস্তিনিকেতনে। সেবার গিয়ে মাস তিনেক ছিলাম। তখন আমার খেলার সাথী ছিল রথীন্দ্রনাথের পালিত মেয়ে পুপে। দুজনের বয়স কাছাকাছি; রোজ সকালে পুপে চলে আসত, আমাদের ছেট কুটিরে ঘণ্টা খানেক খেলা করে চলে যেত। তখন শাস্তিনিকেতনের চারিদিক খোলা। আশ্রম থেকে দক্ষিণে বেরোলেই সামনে দিগন্ত অবধি ছড়ানো খোয়াই। পুর্ণিমার রাতে খোয়াইতে যেতাম আর মা গলা ছেড়ে গান গাইতেন।

মা-ই আমাকে একটা ছেট খাতা কিনে দিয়েছিলেন যেটা নিয়ে মাঝে মাঝে চলে যেতাম কলাতবনে। নন্দলালবাবু সে খাতায় চার দিনে চারটে ছবি একে দিয়েছিলেন আমায়। পেনসিলে গরু আর চিতাবাঘ, রঙ তুলি দিয়ে ভালুক আর ডোরাকাটা বাঘ। বাঘটা একে সব শেষে ল্যাজের ডগায় তুলির একটা ছোপ লাগিয়ে সেটা কালো করে দিলেন। বললাম, 'ওখানটা কালো কেন?'

নন্দলালবাবু বললেন, ‘এই বাঘটা ভীষণ পেটুক। তাই চুকেছিল একটা বাড়ির রামায়রে মাংস চুরি করে খেতে। তখনই ল্যাজের ডগাটা চুকে যায় জলস্ত উন্ননের ভেতর।’

বছর সাতেক বয়সে প্রথম গেলাম দার্জিলিং। থাকব তিন মাসির বাড়ি পালা করে। ক'দিন থাকব তার ঠিক নেই। মনে আছে যাবার পথে ভোরে ট্রেনে যখন ঘুম ভাঙল, আর জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম হিমালয়, তখন মুখের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিলিণ্ডিতে মেটের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়ামাসিমা, কারণ তাঁর বাড়িতেই থাকব প্রথম। ড্রাইভার বাঙালী ভদ্রলোক। এঁকেবেঁকে পথ উপরে উঠে চলেছে পাহাড়ের গা দিয়ে। যতই উপরে উঠছি ততই মেঘ আর কুয়াশা বাড়ছে আর ততই জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন আমাদের ড্রাইভার। বললেন তাঁর নাকি পুরো রাস্তার প্রত্যেকটি মোড় নথদর্পণে, তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই।

মায়ামাসিমার স্বামী অজিত মেসোমশাই দার্জিলিং-এর নাম-করা ডাক্তার (এরই কলকাতার বাড়িতে আমি যুবৎসু শিখতে যেতাম), আর মাসতুতো ভাই দিলীপদা আমার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়ো, নেপালী বলে একেবারে নেপালীদের মতো, বাড়ির গেটের ধারে পা ছড়িয়ে বসে নেপালীদের সঙ্গে তাস খেলে, আর ঘোড়া ছোটায় যেন চেঙ্গিস খাঁ। দিলীপদা পরে দার্জিলিং-এর লেবংরেসের মাঠে কিছুদিন জুকি ছিল। সম্ভবত দার্জিলিং-এর ইতিহাসে একমাত্র বাঙালী জুকি।

দিলীপদার সঙ্গে ক্যারাম খেলাটা জমত ভালো, আর দিলীপদার কাছে ছিল একগাদা কমিক্স বই। কমিক্সের ভক্ত আমি খুব ছেলেবেলা থেকেই। আমার জুর হলেই মা নিউ মার্কেট থেকে চার আনা দিয়ে দুটো নতুন কমিক্স এনে দিতেন—তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগত ‘কমিক কাট্স’ আর ‘ফিল্ম ফান’।

মায়ামাসিমার বাড়ি থেকে গেলাম মনুমাসিমার বাড়ি। এই মাসির স্বামী হলেন সেই মেসোমশাই, যাঁর ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে সোনামামা কাজ করতেন। বাড়ির নাম এলগিন ভিলা, বাড়ির সামনে পাহাড়ের মাথা চেঁচে তৈরি করা টেনিস মাঠ; মেসোর সঙ্গে তাঁর ছেলেরাও টেনিস খেলে।

এই মেসোর বিষয় একটু আলাদা করে বলা দরকার, কারণ ছেলেবেলার আমাদের স্মৃতির অনেকটাই এর কলকাতায় আলিপুরে নিউ রোডের বিশাল বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

অবিনাশ মেসোমশাই একেবারে কেরানি অবস্থা থেকে বিরাট এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানীর মালিকের পদ অবধি উঠেছিলেন। তখন তিনি হাবভাবে একেবারে সাহেব; তাঁকে দেখে তাঁর প্রথম অবস্থা কল্পনা করা

অসম্ভব। মেসোর ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, তার মধ্যে বড় ছেলে অমিয় আমার সোনামামাৰ বন্ধু। দু'জনকে এক সঙ্গে মুগার সুতো দিয়ে ঘূড়ি ওড়াতে দেখেছি বকুলবাগানের ছাত থেকে, যদিও ঘূড়ি ওড়ানোৰ বয়স তখন ওঁদের নয়, আমার। নিউ রোডের বাড়িতে বিয়ে হলে যা ধূমধাম হত, তেমন আমি আর কোথাও দেখিনি। শুধু লোকজন খাওয়ানো নয়, সেই সঙ্গে আমোদের ব্যবস্থাও থাকত। একবার বড় মেয়ের বিয়েতে মেসো ব্যবস্থা করলেন প্রোফেসর চিন্তুরঞ্জন গোস্বামীৰ কমিকের। সেই সময়ে কলকাতার সবচেয়ে নামকরা কমিক অভিনেতা ছিলেন গোস্বামী মশাই। এ জিনিসটা আজকাল ক্রমে উঠে যাচ্ছে। ঘটাখানেক ধরে একজন লোক নানান রংতামাসা করে দর্শককে জমিয়ে রাখবে, এমন ক্ষমতা আজ আর কারুর নেই। চিন্তুরঞ্জন গোস্বামী সেটা অনায়াসে পারতেন। আলিপুরের বিয়েতে তাঁর একটা কমিক আমার এখনো মনে আছে, তার কারণ সেটা শুনে আমার লক্ষণের শক্তিশলের কথা মনে হয়েছিল।

‘রাবণ আসিল যুদ্ধে প’রে বুট জুতো

(আর) হনুমান মারে তারে লাথি চড় শুঁতো—

(নামের কী মহিমা, রামনামের কী মহিমা !)

এই দিয়ে শুরু, আর শেষের দিকে ছিল—

গ্যাংক করে বিধল বাগ দশাননের বুকে

বাপরে বাপ ডাক ছাড়ে ধুয়ো দেখে চোখে

(নামের কী মহিমা !)

বিশ হাতে পটল তোলে, দশ মুখে বাজে শিণে

দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেলল বিশে।

(নামের কী মহিমা !)

এ জিনিস অবশ্য চিন্তুরঞ্জন গোস্বামীৰ মতো কেউ গাইতে পারবে না। কমিক দেখিয়ে আমাদের পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে সব শেষে ভদ্রলোক টপাটপ খেয়ে ফেললেন উনিশটা রসগোল্লা।

অবিনাশ মেসোমশাইৰ একটা আলিসান ইটালিয়ান গাড়ি ছিল যার নাম ল্যানসিয়া। গাড়ি যখন চলত তখন বনেটের ডগায় দপ দপ ক'রে গোলাপী আলো বেরোত একটা কাচের ফড়িং-এর গা থেকে।

আমরা যখন দার্জিলিং গেছি, মা'র তখনো কলকাতার চাকরি হয়নি। দার্জিলিঙে কিছুদিন থাকার পরেই হঠাৎ মাস্টারির চাকরি নিয়ে ফেললে মহারানী গার্লস স্কুলে, আর সেই সঙ্গে আমিও সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম। অন্তুত ইঙ্গুল, ক্লাসে ক্লাসে ভাগ নেই; আমি একটা বড় হলঘরের এক জায়গায় বসে পড়ছি, দূরে ওই কোণে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা ক্লাসে মা অঙ্ক কষাচ্ছেন। ক'দিন

পড়েছিলাম স্কুলে তা মনে নেই। সত্যিই কিছু পড়েছিলাম, না চুপচাপ বসিয়ে রাখা হত আমাকে যতক্ষণ না মা'র ছুটি হয় তাও মনে নেই।

এদিকে মনটা ভারী হয়ে আছে, কারণ মেঘ আর কুয়াশার জন্য এসে অবধি কাঞ্চনজঙ্গী দেখা হয়নি। কলকাতার বাড়ির দেয়ালে টাঙানো আছে ঠাকুরদাদার আঁকা রঙিন কাঞ্চনজঙ্গীর ছবি; মন ছটফট করছে মিলিয়ে দেখার জন্য ছবির কাঞ্চনজঙ্গীর সঙ্গে আসল কাঞ্চনজঙ্গী। অবশ্যে এলগিন ভিলাতে একদিন ভোরবেলা মা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। ছুটে গেলাম জানালার ধারে।

ঠাকুরদাদার ছবিতে ছিল বরফের উপর বাঁ দিক থেকে পড়ছে বিকেলের রোদ, আর এখন চোখের সামনে দেখছি ডানদিক থেকে রঙ ধরা শুরু হয়েছে।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম যতক্ষণ না সূর্যের রঙ গোলাপী থেকে সোনালী, সোনালী থেকে রূপালী হয়। এর পরে নিজের দেশে আর বাইরে পৃথিবীর বহু দেশে বহু নাম করা সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু সুযোদয় আর সূর্যাস্তের কাঞ্চনজঙ্গীর মতো সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখিনি।

ছুটিতে বাইরে সবচেয়ে বেশি ফুর্তি হত মেজোপিসিমার বাড়িতে। পিসেমশাই ছিলেন সদর ডেপুটি অফিসার। তাঁর কাজের জায়গা ছিল বিহার। বদলির চাকরি—কখনো হাজারিবাগ, কখনো দ্বারভাঙ্গা, কখনো মজ়ফরপুর, কখনো আরা—এইভাবে ঘুরে ঘুরে কাজ। আমি যখন প্রথম যাই ওঁদের কাছে তখন ওঁরা ছিলেন হাজারিবাগে। পিসিমার দুই মেয়ে—নিনি আর কুবি, আর তাদের বাপ-মা-হারা খুড়তুতো ভাই বোন কল্যাণ আর লতু। সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড় আর সবাই আমার বন্ধু।

হাজারিবাগে এর পরে আরো কয়েকবার গোছি। প্রথম বার যাওয়া থেকে মনে আছে পিসেমশাই-এর সবুজ রঙের ওভারল্যান্ড গাড়ি। তখনকার গাড়ির লট্টখটে চেহারা দেখে এখনকার লোকের হাসি পাবে, কিন্তু এই ওভারল্যান্ড যে কত তাগড়াই গাড়ি ছিল, আর কত ঝঁঝঁর মধ্যেও সে তার বাহনের কর্তব্য পালন করে এসেছে সেটা পিসেমশাই-এর মুখে শুনতাম।

এই গাড়িতে করেই আমরা গিয়েছিলাম রাজরাঙ্গা। হাজারিবাগ থেকে মাইল চলিশেক দূরে ভেড়া নদী পেরিয়ে মাইল খানেক হাঁটার পর রাজরাঙ্গা। সেখানে গা ছমছম করা ছিমমস্তার মন্দিরকে ঘিরে দামোদর নদীর ওপর জলপ্রপাত, বালি, দূরের বন আর পাহাড় মিলিয়ে অদ্ভুত দৃশ্য।

ফেরার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল ব্রাঞ্ছণবেড়িয়া পাহাড়ের ধারে। পাহাড়ে নাকি অনেক বাঘ ভাল্লুক। গাড়ি সারাতে সারাতে রাত হয়ে গেল, কিন্তু বাঘ ভাল্লুকের দেখা পেলাম না।

যখন ছেট ছিলাম

গাড়িতে কোথাও যাবার না থাকলে সবাই মিলে হেঁটে বেড়াতে বেরোতাম সন্ধ্যাবেলা। ফিরতাম খাবার সময়ের ঠিক আগে। টিমটিমে লঠন আর কেরোসিন ল্যাম্পের আলো, তার মধ্যে বসে গল্ল আর খেলা দারুণ জমত। তাসের খেলা ছিল, ‘আয়না মোহর’ আর ‘গোলাম চোর’। গোলাম চোর সকলেই জানে, কিন্তু আয়না মোহর খেলা আর কাউকে কখনো খেলতে দেখিনি। আর সে খেলার যে কী নিয়ম সেটাও আজ আর মনে নেই।



অন্য খেলার মধ্যে একটা মজার খেলা ছিল ‘হইস্পারিং গেম’। পাঁচ জনে গোল হয়ে বসে খেলা। একজন তার বাঁয়ের লোকের কানে ফিস্ফিস করে একটা কথা বলল। একবারের বেশি বলা চলবে না। সেই একবারে বাঁয়ের লোক যা শুনল, সেটাই সে তাঁর বাঁয়ের লোককে বলল। এই ভাবে কান থেকে কান ঘুরে কথা আবার যে শুরু করেছিল তার কানেই ফিরে এল। মজাটা হচ্ছে কথা শেষ পর্যন্ত কী-তে দাঁড়াল তাই নিয়ে। আমি একবার শুরু করে বাঁয়ের লোকের কানে বললাম, ‘হারাধনের দশটি ছেলে’। সেটা যখন শেষে আমার কানে ফিরে এল, তখন হয়ে গেছে ‘হাঁংলা কানে হাতি হাসে’। দশ বারোজন লোক হলে খেলাটা আরো বেশি জমে।

হাজারিবাগের পরে গিয়েছি দ্বারভাঙ্গা, আর তারও পরে আরা। এই দুটো জায়গাই হাজারিবাগের তুলনায় কিছুই না, কিন্তু তাতে ফুর্তিতে কোনো কমতি হয়নি। ইতিমধ্যে নিনি কুবির আরেক খুড়তুতো বোন ডলি এসে খেলার সাথী আরেকজন বেড়ে গেছে।

দ্বারভাঙ্গাতে প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডওয়ালা বাংলো টাইপের একতলা বাড়ি। কম্পাউন্ডের একদিকে লম্বা লম্বা শিশু গাছ, আম গাছ আর আরো কত কী গাছ। বাড়ির বাঁ পাশে খোলা জায়গায় আরেকটা বড় আম গাছ। সেটা ছিল দোলনার গাছ।

আমরা যখন গিয়েছি তখন বৰ্ষাকাল। এক পশলা বৃষ্টিৰ পৰ দোলনার গাছেৰ তলার ঘাসবিহীন জমিতে সুৰু সকু খাল নালা দিয়ে বৃষ্টিৰ জল বেগে গিয়ে পড়ত নৰ্দমায়। আমরা কাগজেৰ নৌকো তৈৰি কৱে নালার জলে ভাসিয়ে দিতাম। নালা এখন নদী; নৌকো নদীৰ শ্ৰেতে ভেসে গিয়ে পড়ত নৰ্দমার সমুদ্রে।

মাঝে মাঝে এই নৌকো হয়ে যেত ভাইকিং-এৰ নৌকো। হাজাৰ বছৰ আগে নৱওয়েতে জলদস্য ছিল—তাদেৱ বলা হত ভাইকিং। আমরা মনে কৱে নিতাম যে ভাইকিংদেৱ মধ্যে কেউ জলপথে মাৰা গেলে তাকে নৌকোতেই দাহ কৱা হয়। আমরা কাগজেৰ জলদস্য তৈৰি কৱে কাগজেৰ নৌকোয় তাকে শুইয়ে দিয়ে তাৰ মুখে আগুন দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিতাম বৃষ্টিৰ জলে। এটা ছিল ‘ভাইকিংস ফিউনারেল’। অবিশ্যি ভাইকিং-এৰ সঙ্গে নৌকোও দাহ হয়ে যেত।

আৱায় যখন গিয়েছি তখন আমাৰ বয়স নয়। লাল ইঁটেৱ বিশাল বাড়ি পিসেমশাইয়েৱ। মাৰখানে উঠোন ঘিৰে বেশ অনেকগুলি ঘৰ; যদুৰ মনে পড়ে, তাৰ কয়েকটা ব্যবহাৰই হত না। দেওতলার ছাতেৱ সঙ্গে কিছু ঘৰও ছিল, তাৰই একটা ছিল পিসেমশাইয়েৱ কাজেৰ ঘৰ। বাড়িৰ সঙ্গে মানানসই বাগানও ছিল।

কল্যাণদা যদিও আমাৰ চেয়ে বছৰ ছয়েকেৰ বড়, সে তখন আমাৰ বিশেষ বৰুৱা। সে স্ট্যাম্প জমায়; তাৰ দেখাদেখি আমিও জমানো শুক কৱেছি, হিঞ্জ কিনেছি, টুইজারস (চিমটে) কিনেছি, এমন কি একটা ম্যাগনিফাইং প্লাসও জোগাড় কৱেছি স্ট্যাম্পে কোনো ছাপাৰ ভুল আছে কি না দেখাৰ জন্য। ভুল থাকলেই সে টিকিটেৱ দাম অনেক বেড়ে যায়। দিশি বিলিতি যে কোনো টিকিট হাতে পেলেই চোখে ম্যাগনিফাইং প্লাস। নাঃ—এটাতে তো কোনো ভুল নেই। এটাতেও না। কোনো টিকিটে কোনোদিনই ছাপাৰ কোনো ভুল পাইনি। তাই বোধহয় শেষ পৰ্যন্ত নিৰংসাহ হয়ে টিকিট জমানো ছেড়ে দিই।

কল্যাণদাৰ আৱেকটা ভূমিকা ছিল সেটা এখানে বলা দৱকাৰ।

ক্রিসমাস ব্যাপারটাৰ উপৰ ছেলেবেলা থেকেই একটা টান ছিল সেটা আগেই বলেছি। ফাদাৰ ক্রিসমাস বলে যে একটা বুড়ো দাঢ়িওয়ালা লোক আছে, আৱ সে যে ক্রিসমাসেৱ আগেৱ দিন রাত্তিৰে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেৱ ঘৰে চুকে, খাটেৱ রেলিং-এৰ ঝোলানো তাদেৱ মোজাতে খেলনা ভৱে দিয়ে যায়, এটা বোধহয় পুৱোপুৱি বিশ্বাস কৱতাম।

মেজোপিসিমাৰ বাড়িতে যত ফুৰ্তি, তেমন তো আৱ কোথাও নেই। তাই সে ফুৰ্তি থেকে ক্রিসমাসটা বাদ পড়ে কেন? ডিসেম্বৰ মাসেৱ দৱকাৰ কী? যে কোনো মাসেই তো হতে পাৱে ক্রিসমাস!

আৱাতে তাই জুন মাসে কল্যাণদা হয়ে গেল ফাদাৰ ক্রিসমাস। আমাৰ খাটেৱ রেলিং-এ মোজা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। রাত্তিৰে আমি মটকা মেৰে পড়ে রাইলাম

বিছানায়। তুলো দিয়ে দাঁড়িগোফ কৱে আঠা দিয়ে লাগিয়ে পৱে নিল কল্যাণদা। পিঠে একটা থলি চাই, কাৰণ তাতে জিনিস থাকবে; আৱ ফাদাৰ ক্রিসমাস যে আসছেন সেটা জানান দেওয়া চাই। তাই থলিতে অন্য জিনিসেৱ সঙ্গে পুৱে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু খালি টিনেৱ কোটো।

আধ ঘণ্টা থানেক চুপটি কৱে শুয়ে থাকাৰ পৰ শব্দ পেলাম ঘম্ ঘম্ ঘম্ ঘম্।

একটু পৱে আবছা অন্ধকাৰে আধ বোজা চোখে দেখলাম ফাদাৰ-ক্রিসমাসবেশী কল্যাণদা থলি নিয়ে চুকল, খাটেৱ রেলিং-এৰ পাশে এসে থামল, আৱ তাৰ পৱেই খুটখাট শব্দে বুৰালাম আমাৰ মোজাৰ মধ্যে কী জানি পুৱে দেওয়া হচ্ছে। সব ফাঁকি সেটা নিজেও জানি, কিন্তু তাৰ মজাৰ শেষ নেই।

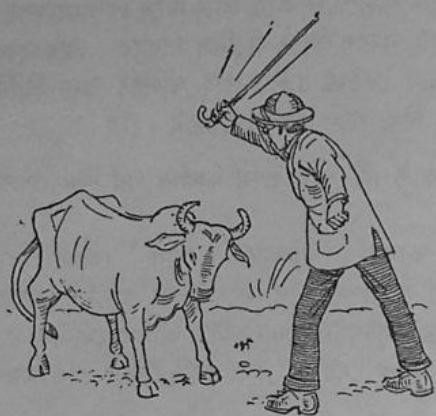
সেৱাৰ ধনদাদুও এসেছিলেন আৱাতে আমরা থাকতে থাকতেই। আমরা ভাই ৰোনেৱ দল সবাই বিকেলে বেড়াতে বেৱোতাম দাদুৰ সঙ্গে। আৱ স্টেশন ছিল আমাদেৱ বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক। স্টেশনেৱ প্ল্যাটফৰ্মে দাঁড়িয়ে সক্রে সময়ে দেখতাম ইম্পৰিয়াল মেল আমাদেৱ সামনে দিয়ে দশ দিক কাঁপয়ে সিটি মারতে মারতে ছুটে বেৱিয়ে গেল। এই জাঁদৱেল ট্ৰেনেৱ কামৱাৰ বাইৱেটা ছিল হালকা হলদেৱ রঙেৱ; আৱ তাৰ উপৰ ছিল সোনালী রঙেৱ নকশা। আৱ কোনো ট্ৰেনেৱ এত বাহাৰ বা দাপট ছিল না।

একদিন সবাই যাছি স্টেশনেৱ দিকে, দাদু সোলাটুপি ও হাতে লাঠি সমেত পুৱোদন্তৰ সাহেবী পোশাক পৱে আমাদেৱ সামনে সামনে চলেছেন। এমন সময় কোথেকে এক গৰু শিঙ বাগিয়ে চোখ রাঙিয়ে ধেয়ে এল আমাদেৱ দিকে। এমন হিংস্ব গৰু আৱ আমি দেখিনি কখনো। দাদু তক্ষুনি বললেন, ‘তোমোৱা মাঠে নেমে যাও।’

মাঠে নামতে হলে যে ফণীমনসাৰ বেড়া ভেদ কৱে যেতে হয় সে খেয়াল দাদুৰও নেই, আমাদেৱও নেইণ মনসাৰ বোপেৱ মধ্যে দিয়েই মাঠে গিয়ে নামলাম। হাতে পায়ে কাঁচৰ আঁচড়ে জখমটা যে কতদুৰ হয়েছে সেটা সে অবস্থাৰ বুৰাতেই পারিনি। আমরা বোপেৱ ফাঁক দিয়ে দম বৰু কৱে দেখছি দাদু গৰুৰ দিকে মুখ কৱে দু পা ফাঁক কৱে দাঁড়িয়ে হাতেৱ লাঠিটা এৱোপ্লেনেৱ প্ৰপেলাৱেৱ মতো বন কৱে ঘোৱাচ্ছেন, আৱ গৰুটাৰ শিঙ বাগিয়ে হাত পাঁচেক দূৰে দাঁড়িয়ে এই অন্তুত মানুষটাৰ অন্তুত কাণ দেখে থমকে গেছে।

দাদুৰ এই তেজ পাগলা গৰু মিনিট থানেকেৱ বেশি সহ্য কৱতে পাৱেনি।

গৰু হটে যাবাৰ সঙ্গে সঙ্গেই আমৱাও সাহস পেয়ে সাবধানে বাড়তি জখম বাঁচিয়ে বেৱিয়ে এলাম বোপেৱ পেছন থেকে।



সেই বাই পরের দিকে আরাতে আরেকটা বড় দল গিয়ে হাজির হয়েছিল। এরা ছিল আমার ছোটদাদু প্রমদারঞ্জন রায়ের আট ছেলেমেয়ের মধ্যে জন্ম চারেক। আমরা যখন ভবানীপুরে ছোটদাদুও তখন রিটায়ার করে ভবানীপুরেই থাকেন, চন্দ্রমাধব ঘোষ রোডে। ছোটদাদু সরকারী জরিপ বিভাগে কাজ করতেন, আর সেই কাজ তাঁকে নিয়ে যেত আসাম-বর্মার দুর্গম জঙ্গলে পাহাড়ে। আমি অবিশ্য ছোটদাদুকে ভালো ভাবে চিনি তিনি চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে। নিজে দারুণ শক্ত মানুষ ছিলেন বলেই বোধহয় শরীর চর্চার দিকে ভয়ানক দৃষ্টি দিতেন। কাউকে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখলেই পিঠে মারতেন এক খোঁচা। এনার প্রাণখেলা অতিহসির শব্দ রাস্তার এমোড় থেকে ওমোড় শোনা যেত, আর ইনি একরকম ভাবে শিস দিতে পারতেন, যেটা পাঢ়ার সব লোকের পিলে চমকে দিত।

কাকা পিসীদের মধ্যে সকলেই পড়াশুনায় ভীষণ ভালো ছিল। তিনি বোনের মধ্যে মেজো লীলুপিসীকে (যিনি এখন সন্দেশের একজন সম্পাদিকা) তখন চিনতাম অঁকিয়ে হিসেবে। এক ভাই কল্যাণ চুপচাপ মানুষ, ভোর চারটেয় ঘূম থেকে ওঠে, আর রাত্তিরে বাইশটা হাতে গড়া রুটি খায়। পরের ভাই অমির ছিল দুর্দান্ত স্ট্যাম্পের কালেকশন; সরোজ ছিল তখন বায় পরিবারের সবচেয়ে লম্বা মানুষ; ছোট যতু নিজের চেহারা সম্বন্ধে বেশ খানিকটা সচেতন, কাছে আয়না পেলে একবার আড়চোখে নিজেকে দেখে নেবার লোভ সামলাতে পারে না।

সবচেয়ে বড় ভাই প্রভাতকাকার অক্ষের মাথা দুর্দান্ত আর তার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তার একটা কারণ এই যে ছোটকাকার মতো

প্রভাতকাকারও অভাস ছিল আঞ্চলিক জনদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসা। এই কাজটা অনেক সময়েই তিনি হেঁটে করতেন; হ'সাত মাইল হাঁটাটা প্রভাতকাকার কাছে কিছুই ছিল না; আমাদের বাড়িতেও আসতেন মাঝে মাঝে, আর টার্জানের গল্ল পড়ে বাংলা করে শোনাতেন। আমাকে প্রভাতকাকা ডাকতেন খুড়ো বলে।

চতুর্থ ভাই সরোজ তখন সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে একটা নতুন ইস্কুল থেকে, আর ছোট যতু তখনও সেই ইস্কুলে পড়ে। আট বছর বয়স অবধি আমি মার কাছে বাড়িতেই পড়েছি; নতুন ইস্কুলটা ভালো শুনে মা ঠিক করলেন আমাকে ওখানেই ভর্তি করবেন।

ইস্কুলের কথায় পরে আসছি, কিন্তু একটা কথা এইবেলা বলে রাখি—ছুটি জিনিসটা যে কী, আর তার মজাটাই বা কী, সেটা ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে জানা যায় না। এক তো রবিবার আর নানান পরবের ছুটি আছে, তাছাড়া আছে গ্রীষ্মের আর পুজোর ছুটি। এই দুটো বড় ছুটি আসার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মনটা খুশির সুরে বাঁধা হয়ে যেত। ছুটির মধ্যে কলকাতায় পড়ে আছি, এ জিনিস তখন কমই হত।

খুব বেশি করে মনে পড়ে দুটো ছুটির কথা।

একবার আমাদের বাড়ির লোক, লখনৌয়ের মেজোমামা-মামী আর মামাতো ভাইয়েরা, আমার ছোটকাকা আর আরো কয়েকজন আঞ্চলিক জন মিলে এক বিরাট দল গোলাম হাজারিবাগে। Kismet নামে এক বাংলা ভাড়া করে ছিলাম আমরা। খাবার-দ্বাবার টাট্কা ও সন্তা, চমৎকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। ক্যানারি হিলের চূড়োয় ওঠা, রাজরাঙ্গায় পিকনিক, বোখারো জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া—সব মিলিয়ে যেন সোনায় মোড়া দিনগুলো। সঙ্গাবেলা পেট্রোম্যাস্কের আলোয় দল করে নানান রেশারেশির খেলা। সবচেয়ে আমাদের খেলা ছিল Charade। এ খেলার বাংলা নাম আছে কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়িতেও এ খেলার চল ছিল। দু' দলে ভাগ করে খেলতে হয়—পালা করে এক দল অভিনেতা, এক দল দর্শক। যারা অভিনয় করবে তারা এমন একটা কথা বেছে নেবে যেটা দুটো বা তারও বেশি কথার সমষ্টি। যেমন করতাল (কর+তাল), সন্দেশ (সন+দেশ), সংযমশীল (সং+যম+শীল); সংযমশীল কথাটা যদি বেছে থাকে অভিনয়ের দল, তাহলে তাদের পর পর চারটে ছোট ছোট দৃশ্য অভিনয় করে দেখাতে হবে দর্শকের দলকে। প্রথম দৃশ্যে ‘সং’, দ্বিতীয় দৃশ্যে ‘যম’ আর তৃতীয় দৃশ্যে ‘শীল’ কথাটা বুবিয়ে সব শেষে পুরো কথাটা অভিনয় করে বোঝাতে হবে। দুরকম Charade হয়—Dumb Charade আর Talking Charade। যদি Dumb

Charade খেলা হয়, তাহলে শুধু মূকাভিনয় করে কথাগুলো বোঝাতে হবে। আর যদি Talking Charade হয় তাহলে অভিনেতাদের কথবার্তার মধ্যে এক আধবার বাছাই করা কথাগুলো চুকিয়ে দিতে হবে। দর্শকের দলকে চারটে দৃশ্যের অভিনয় দেখে পুরো কথাটা বার করতে হবে। বড় দল হলেই খেলাটা জমে ভালো। আমরা ছিলাম প্রায় দশ-বারো জন। সঙ্গেটা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত তা টেরই পেতাম না।

আরেকটা স্মরণীয় ছুটি কেটেছিল স্টিম লঞ্চে করে সুন্দরবন সফরে। আমার এক মেসোমশাই ছিলেন একসাইজ কামিশনার। তাঁকে সুন্দরবনে কাজে যেতে হত মাঝে মাঝে। একবার তিনি বেশ কয়েকজন আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিলেন, তার মধ্যে আমি আর মাও ছিলাম। মাসি আর মেসো ছাড়া ছিলেন চার মাস তুতো দিনি আর রঞ্জিত্ব। রঞ্জিত্ব বা 'রণদ' ছিলেন শিকারী; সঙ্গে নিয়েছিলেন বন্দুক আর অজস্র টোটা। মাতলা নদী ধরে যেতে হবে আমাদের একেবারে মোহানা পর্যন্ত, আর তারই ফাঁকে সুন্দরবনের খাল বিলের মধ্যে দিয়ে ঘূরবে আমাদের লঞ্চ। সবশুন্দ পনেরো দিনের ব্যাপার।

সফরের বেশির ভাগটা সময়ই ডেকে বসে দৃশ্য দেখে কেটেছে। মাতলা বিশাল চওড়া নদী, প্রায় এপার ওপার দেখা যায় না। সারেঙ্গো মাঝে মাঝে জলে বালতি নামিয়ে দেয়, আর তুললে পরে দেখা যায় জলের সঙ্গে উঠে এসেছে প্রায়-স্বচ্ছ জেলিফিশ। যখন খালের ভিতরে ঢোকে লঞ্চ তখন দৃশ্য যায় একেবারে বদলে। দূর থেকে দেখছি খালের পারে সার সার কুমীর রোদ পোহাচ্ছে, তার পিঠে বক বসে আসে দিবিয়, আর কাছে এলেই কুমীরগুলো সড়াৎ সড়াৎ করে নেমে যায় জলে। যেদিকে কুমীর সেদিকে জঙ্গল পাতলা, বেশির ভাগ গাছই বেঁটে, আর অপর পারে বিশাল বিশাল গাছের গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে হরিণের পাল চোখে পড়ে। তারাও লঞ্চের শব্দ শুনলেই ছুট লাগায়।

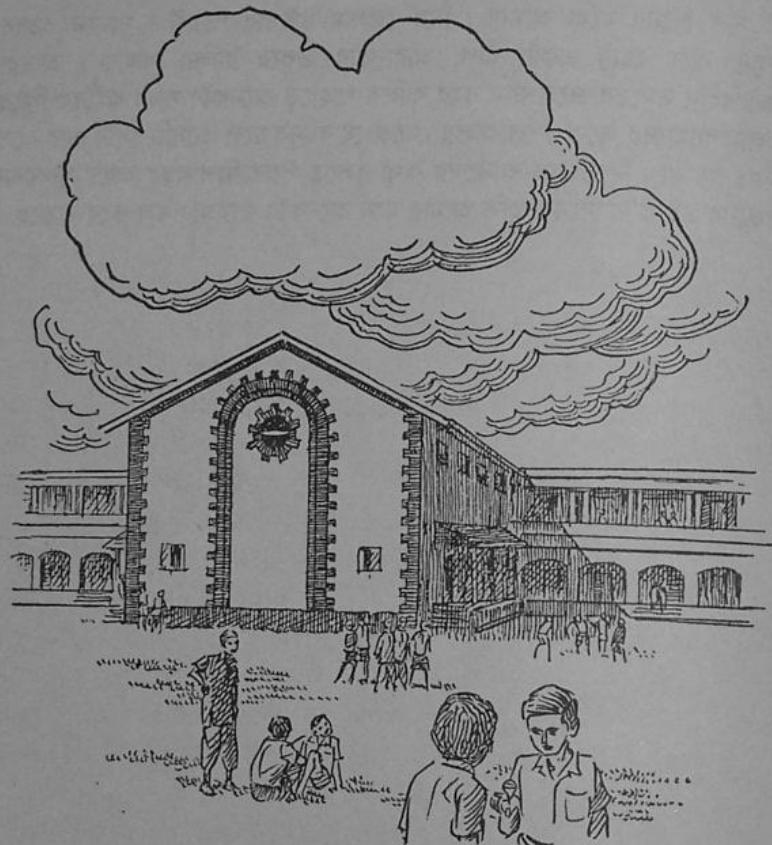
একদিন আমরা লঞ্চ থেকে নেমে নৌকো করে ডাঙায় গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলাম এক আদিকালের পোড়ো কালী মন্দির দেখতে। মাটি ফুঁড়ে বল্লমের মতো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে একরকম শেকড়, হাতে লাঠিতে ভর করে তার ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে এগোতে হয়। সঙ্গে বন্দুকধারী আছেন দুজন, কারণ এ তল্লাটেই বাঘের আস্তানা, বাবাজী কখন দেখা দেন তা বলা যায় না।

বাঘ আমরা দেখিনি এ যাত্রায়, কিন্তু শিকারী রণদা একটা কুমীর মেরেছিলেন। এক জায়গায় খালের ধারে ডাঙায় কুমীরের প্রাচুর্য দেখে লঞ্চ থামানো হল। রণদা নৌকো করে চলে গেলেন সঙ্গে তিনজন লোক নিয়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা দম বন্ধ করে বসে থাকার পর একটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। লঞ্চ থেকে বেশ দূরে চলে যেতে হয়েছিল শিকারীর দলকে।

যখন ছোট ছিলাম

আরো আধ ঘণ্টা পরে নৌকো ফিরল এক কুমীরের লাশ সঙ্গে নিয়ে। সে কুমীরের ছাল ছাড়ানো হল লঞ্চের নিচের ডেকে। সে ছাল দিয়ে রণদা সুটকেস বানিয়েছিলেন।

সাত দিনের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম টাইগার পয়েন্ট। সামনে অগাধ সমৃদ্ধ, বাঁয়ে ছোট একটা দ্বীপ, আর তার উপরে বালির পাহাড়। আমরা টেউবিহীন সমুদ্রের জলে স্নান করে বালির পাহাড়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম আমাদের লঞ্চে। লোকালয় থেকে যে বহুদূর চলে এসেছি সেটা আর বলে দিতে হয় না। নির্ভেজাল আনন্দের কথা বলতে পায়তাঞ্চিশ বছর আগে সুন্দরবন সফরের এই ক'টা দিনের স্মৃতি আমার মনে অনেকটা জায়গা দখল করে রয়েছে।



বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

ইঙ্কুলে

ছেলেবেলা কখন শেষ হয় ? অন্যদের কথা জানি না, আমার মনে আছে ছেদিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার শেষ পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে এসে টেবিলের উপর থেকে মেক্যানিক্সের বইটা তুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছিল আমি আর ছোট নেই, এর পর কলেজ, এখন থেকে আমি বড় হয়ে গোছি ।

তাই আমি আমার ইঙ্কুল জীবনের কথা দিয়েই আমার ছেলেবেলার কথা শেষ করব ।

আমি যখন ইঙ্কুলে ভর্তি হই তখন আমার বয়স সাড়ে আট । মামাবাড়িতে তখন আরেকটি মামা এসে ডেরা বেঁধেছেন । এর নাম লেবু । এর কথা আগেই বলেছি । একদিন সকালে লেবুমামার সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে । যে ক্লাসে ভর্তি হব—ফিফ্থ ক্লাস (পরে নাম হয়েছিল ক্লাস সিঙ্গ) —সেই ক্লাসের মাস্টার আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে দিলেন, আর গোটা চারেক অক্ষ কবতে দিলেন । আমি অন্য একটা ঘরে বসে উত্তর লিখে আবার মাস্টারের কাছে গিয়ে হাজির হলাম । মাস্টার তখন ইংরিজির ক্লাস নিচ্ছেন । আমার উত্তরের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন । তার মানে উত্তরে ভুল নেই । আর তার মানে আমার ইঙ্কুলে ভর্তি হওয়া হয়ে গেল ।

কাঠের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে মাস্টারের হাত থেকে খাতা ফেরত নিচ্ছি, এমন সময় ক্লাসের একটি ছেলে (পরে জেনেছিলাম তার নাম রাণা) গলা তুলে আমাকে জিগ্যেস করল, ‘তোমার নাম কী ভাই ?’ আমি বললাম আমার নাম ।—‘আর ভাকনাম ?’ জিগ্যেস করল মিচকে শয়তান রাণা দাশ । আমার কোনো ধারণা নেই যে ইঙ্কুলে চট্ট করে নিজের ভাকনাম বলতে নেই । আমি তাই সরল মনে ভাকনামটা বলে দিলাম ।

সেই থেকে আমার ক্লাসের বা ইঙ্কুলের কোনো ছেলে আমাকে ভালো নাম ধরে ডাকেনি । সে নামটা ব্যবহার করতেন শুধু মাস্টারমশায়রা ।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলটা ছিল ল্যানসডাউন রোড পেরিয়ে বেলতলা রোড পুলিশ থানার পূর্ব গায়ে । ইঙ্কুলের পুরে যে রাস্তা, তার ওপারে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ । সেখান থেকে বছরে একবার করে বি. টি-র ছাত্ররা এসে আমাদের ক্লাস নিত ।

উঁচু পাঁচিলে যেরা ইঙ্কুলের দক্ষিণ অংশটা খেলার মাঠ । আকাশ থেকে দেখলে ইঙ্কুলের বাড়িটাকে দেখাবে ইংরেজি T অক্ষরের মতো । তলার ঝুলে

থাকা অংশটা হল ইঙ্গুলের হলঘর আৰ মাথাৰ লম্বা অংশটা ক্লাসকুমৰেৰ সাবি। গেট দিয়ে চুকে ডাইনে দারোয়ানেৰ ঘৰ, বাঁয়ে একটা গেলেই একটা বট গাছ। তাৰ শুঁড়িটাকে ঘিৱে একটা সিমেন্ট বাঁধানো বেদি। গাছেৰ নিচে অনেকখনি জায়গা জুড়ে ঘাস নেই, কাৰণ সেখানে টিফিন টাইমে মাৰ্বেল খেলে ছেলেৱা। খেলাৰ মধ্যে বড় মাঠে ফুটবল, ক্ৰিকেট, হকি সবই হয়। আৰ বছৰে একদিন হয় স্পোর্টস। এছাড়া মাৰ্বেল, ডাংগুলি, হাড়ডু, লাটুৱ খেলা ইত্যাদিতো আছেই।

দারোয়ানেৰ ঘৰ পেৱিয়ে মোৱাম বিছানো পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে তিনধাৰ্প সিডি উঠে পুব-পশ্চিমে টানা ইঙ্গুলেৰ বারান্দা। বারান্দার ডাইনে সারবাঁধা ক্লাসকুম আৰ বাঁয়ে অৰ্ধেক পথ গিয়ে হলঘৰেৰ দৰজা। গ্যালারিওয়ালা হলঘৰে সবচেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হল বাংসৱিক পুৱৰ্কাৰ বিতৰণী। এছাড়া সৱৰষ্টী পুজোয় পাত পেড়ে খাওয়া হয়, মাৰো মাৰো বকৃতা হয়, আৰ একবাৰ মনে আছে গ্ৰীনবাগ অ্যাণ্ড সেলিম বলে দুই বিদেশী অভিনেতা এসে শেকসপিয়াৱেৰ মাৰ্চেন্ট অফ ভেনিস থেকে কয়েকটা দৃশ্য অভিনয় কৰেছিল। আমোৱা সবাই ফোক্সিং চেয়াৰে বসে জীবনে প্ৰথম শেকসপিয়াৰ দেখছি, আৰ আমাদেৱ কাছেই দাঁড়িয়ে ইংৰিজিৰ মাস্টাৰ বজেনবাবু চোখ বড় বড় কৰে স্টেজেৰ দিকে চেয়ে অভিনেতাদেৱ সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়ে চলেছেন—বোধ হয় যাচাই কৰে দেখছেন ছাত্ৰ জীবনে পড়া নাটকটাৰ কতখনি মনে আছে। একবাৰ, বোধ হয় সৱৰষ্টী পুজোৰ দিনেই, আমাদেৱ হলে চাৰি চাপলিনেৰ ছবি দেখানো হল। শো যে হৈবে, তাৰ নোটিস আগেৰ দিন দারোয়ান এসে আমাদেৱ ক্লাসে আহমেদ স্যারেৰ হাতে তুলে দিল। আহমেদ স্যার পড়লেন, ‘ধূ দ্য কাইও কাৰ্টসি অফ মেসারস্ কোদক কোম্পানি—’ ইত্যাদি। কোড্যাক কোম্পানিৰ নাম স্যারেৰ জানা নেই, তিনি ভাবলেন নামটা দিশি, মোদকেৱ জাতভাই-টাই হবে আৰ কী!



বারান্দার শেষ মাথায় পৌঁছে সিডি দিয়ে নামলেই সামনে দেখা যায় ছাউনিৰ তলায় দুটো পাশাপাশি জল খাবাৰ ট্যাঙ্ক। ঘাড় নিচু কৰে কল খুলে আঁজলা কৰে জল খেতে হয়। ট্যাঙ্ক দুটোৱ ওপাৰে পশ্চিমেৰ দেওয়ানেৰ লাগোয়া হল কাপেন্টি ক্লাস, যেখানে তৰফদাৰ স্যারেৰ আধিপত্য। হাতুড়ি, বাটালি, রেঁদা, কৰাত, ফ্ৰেটওয়াৰ্ক মেশিন কোনোটাৱই অভাৱ নেই সেখানে, আৰ সব সময়ই ক্লাসেৰ ভিতৰ থেকে নানাৱকম যান্ত্ৰিক শব্দ শোনা যায়।

দোতলাৰ সিডি দিয়ে উঠে সামনেই দেখা যায় বারান্দার রেলিং-এৰ উপৰ বুলহে ইঙ্গুলেৰ ঘণ্টা। দারোয়ান ছাড়া এই ঘণ্টা বাজায় কাৰ সাধ্য। দড়ি ধৰে ঘণ্টায় কাঠি মাৰলে ঘণ্টা ঘুৱে যায়—একটাৱ বেশি ঢং বেৱোয় না ঘণ্টা থেকে। দারোয়ান যে কী কৰে ম্যানেজ কৰে সেটা আমাদেৱ সকলেৰ কাছেই রহস্য।

সিডি দিয়ে উঠে বাঁয়ে ঘুৱলে আপিস ঘৰ পেৱিয়ে হেডমাস্টাৰমশাইয়েৰ ঘৰ। আপিসে একটি আলমাৱি ভৰ্তি বই। সেটাই হল ইঙ্গুলেৰ লাইব্ৰেৰি। বইয়েৰ মধ্যে তিনটে—সিন্ধবাদ, হাতেমতাই আৰ দাগোবাট—এত পপুলাৰ যে হাত ঘুৱে ঘুৱে তাদেৱ অবস্থা শোচনীয়। তিনটে একই সিৱিজেৰ বই। সিন্ধবাদতো সবাই জানে, আৰ হাতেমতাই-এৰ নাম এখনো মাৰো শোনা যায়, কিন্তু দাগোবাটোৱ নাম ইঙ্গুল ছাড়াৰ পৱে আৰ শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

ইঙ্গুলেৰ দপুৰীৰ কাজও এই আপিস ঘৱেই। গোল ডাঙুৰ মতো রুলাৰ গড়িয়ে গড়িয়ে খাতায় লাল নীল কালি দিয়ে সমান্তৰাল লাইন টানা দেখতে ভাৱী অনুত্ত লাগত সেটা এখনো মনে আছে।

সিডি উঠে ডাইনে গেলে প্ৰথমে পড়বে মাস্টাৰমশাইদেৱ কমনৱৰ্ম, তাৰপৰ সারবাঁধা ক্লাসকুম। একতলা দোতলা মিলিয়ে সবসুন্দ আটটা ক্লাস—ঢী থেকে টেন। প্ৰত্যেক ক্লাসে দুজন পাশাপাশি বসাৱ ঘোলোটাকৰে ডেক্ষ, কোনো ক্লাসেই ত্ৰিশ বত্ৰিশ জনেৰ বেশি ছাত্ৰ নেই। দশটায় ইঙ্গুল বসে। একটায় এক ঘণ্টা তিফিনেৰ ছুটি, তাৰপৰ চারটে পৰ্যন্ত ক্লাস। গীতেৰ ছুটিৰ পৰ মাসখানেক মৰ্নিং ইঙ্গুল। সকাল সাতটাৱ ক্লাস বসে। উত্তোলনেৰ রোদ তখন জানালা দিয়ে ক্লাসে চুকে ক্লাসেৰ চেহারা একেবাৱে পালটে দেয়। মাস্টাৰমশাইদেৱও কেন জানি সকালে কম ভীতিজনক বলে মনে হয়। সূৰ্য মাথাৰ উপৰ উঠলেই বোধ হয় মানুষেৰ মেজাজটা আৱো তিৰিক্ষ হয়ে যায়। মৰ্নিং ইঙ্গুলটা তাই অনেক বেশি স্নিখ বলে মনে হত।

অবিশ্যি এ থেকে যদি মনে হয় যে মাস্টাৰমশাইদেৱ বেশিৰ ভাগেৱই মেজাজ তিৰিক্ষ ছিল, সেটা কিন্তু ঠিক হবে না। বৰং এটাই ঠিক যে কিছু বাছাই কৰা দুষ্ট ছেলেদেৱ উপৰ কিছু মাস্টাৱেৰ রাগ গিয়ে পড়ত মাৰো-মধ্যে। মাস্টাৰ বুৰে এবং অপৱাধ বুৰে শাস্তিৱও রদবদল হত। কিল, চড়, কানমলা, বুলপি ধৰে উপৰে

টান, বেঁধে দাঁড়ানো, কান ধরে এক পায়ে দাঁড়ানো—সব রকমই দেখেছি
আমরা। তবে আমি নিজে কোনোদিন এসব ভোগ করেছি বলে মনে পড়ে না।
ভালো ছেলে, শান্ত শিষ্ট (কেউ কেউ জুড়ে দিত ‘লেজ বিশিষ্ট’) ছেলে হিসেবে
গোড়া থেকেই একটা পরিচয় তৈরি হয়ে গিয়েছিল আমার।

আমি ছব্বিংহ ইঞ্জিল জীবনে দুজন হেডমাস্টারকে পেয়েছিলাম। প্রথম যখন
তর্তি হই তখন ছিলেন নগেন মজুমদার। তোমরা সন্দেশে ননীগোপাল
মজুমদারের গল্প পাও মাঝে মাঝে; নগেনবাবু ছিলেন ননীগোপালের বাবা। তিনি
যে হেডমাস্টার সেটা আর বলে দিতে হত না। অস্তত আমার কল্পনার
হেডমাস্টারের সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল যোলো আনা। মাঝারি হাইট, ফরসা
রঙ, ঝুপো সাদা গৌঁফ, সাদা চুল, পরনে গলাবন্ধ কোট আর প্যান্ট। মেজাজ যে
শুধু গন্তীর তা নয়, ক্ষুলে তাঁর মুখে কেউ কোনোদিন হাসি দেখেছে কিনা সন্দেহ।
বছরের শেষে বাংসরিক পরীক্ষার পর একটা বিশেষ দিনে তিনি প্রত্যেকটি ক্লাসে
গিয়ে হাতের লিস্ট দেখে পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় কে হয়েছে সে
নামগুলো পড়ে শোনাতেন। ক্লাসের বাইরে ‘নগা’-র জুতোর আওয়াজ পেলেই
বুকের ভেতর যে ধড়ফড়নি শুরু হত তার কথা কোনোদিন ভুলব না।

নগেনবাবুর পরে এলেন যোগেশবাবু, যোগেশচন্দ্র দত্ত। এর চেহারা
নগেনবাবুর চেয়ে কিছুটা চিমড়ে আর গোঁফটা ঠাঁটের নিচে অনেকটা কম জায়গা
দখল করে; কিন্তু ইনি মার্ক-মারা হেডমাস্টার। এর প্যান্টটা ছিল ঢেলা
গোছের। তখন আমরা ক্লাসে রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প পড়ছি; তাতে একরকম
প্যান্টের কথা আছে যার নাম গ্যালিলিগ্যাসকিন্স। তিনি চারশো বছর আগে
আমেরিকায় এই প্যান্ট চালু ছিল। এই গাল ভরা নামওয়ালা প্যান্টটি যে আসলে
কিরকম দেখতে সেটা আমাদের কারুরই জানা নেই, কিন্তু আমরা ঠিক করে
নিলাম যে ওটা যোগেশবাবুর ঢেলা প্যান্টের মতোই হবে। তাই যোগেশবাবুর
প্যান্ট তখন থেকে আমাদের কাছে হয়ে গেল গ্যালিলিগ্যাসকিন্স।

এই যোগেশবাবুর নাম যে কেন ‘গাঁজা’ হল সেটার কারণ আর এখন মনে
নেই। হয়ত যোগেশ থেকে যগা থেকে গজা থেকে গাঁজা। তবে এনার সম্বন্ধে
আমাদের ভীতি খানিকটা কেটে গিয়েছিল যখন একদিন ইনি আমাদের একটা
ক্লাস নিলেন। কোনো একজন মাস্টারমশাই অনুপস্থিত ছিলেন, তাই এই ব্যবস্থা।
আশ্চর্য, সেদিনের ক্লাসে যতটা মজা পেয়েছিলাম, যত নতুন জিনিস শিখেছিলাম,
সেরকম আর কখনো হয়নি। ‘গেঞ্জি কথাটা কোথা থেকে এসেছে কে বলতে
পারে?’ এই ছিল যোগেশবাবুর প্রথম প্রশ্ন। আমরা কেউই বলতে পারলাম না।
যোগেশবাবু বললেন, ‘কথাটা আসলে ইংরিজি—Guernsey। ইংলিশ চ্যানেলে
ফ্রান্সের উপকূলের কাছাকাছি একটি ছোট্ট দ্বীপের নাম Guernsey। সেখান

যখন ছোট ছিলাম

থেকেই এই জামার নাম, যেটা ওদের দেশে খালাসীরা পরত।

যোগেশবাবু আরো বললেন যে বাঙালীরা এককালে এক ধরনের ওভারকোট
পরত যাকে তাঁরা বলতেন অলেস্টার। এই কোটের আসল নাম নাকি Ulster,
আর এ নামটাও এসেছে একটা জায়গার নাম থেকে। আয়ারল্যাণ্ডের আলস্টার
নামে একটি শহরে এই কোট প্রথম চালু হয়।

এর পরে যোগেশবাবু যেটা করলেন সেটা আমাদের বেশ তাক লাগিয়ে দিল।
ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে উনি প্রথমে লিখলেন—

এফো দুই তিন চার পাঁচ হয় মাত্র থাই নঘু

তারপর প্রত্যেকটা কথা থেকে খানিকটা অংশ মুছে দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াল—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

এই ঘটনার পরে গাঁজা হয়ে গেলেন আমাদের বেশ কাছের মানুষ।

হেডমাস্টারমশাইয়ের পরেই যাঁকে সবচেয়ে বেশি সমীহ করতাম তিনি হলেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। এঁকে আমরা লাহিড়ী স্যার বা
জ্যোতির্ময়বাবু না বলে সব সময়েই মিস্টার লাহিড়ী বলতাম, তার কারণ
মাস্টারমশাইদের মধ্যে এনার মতো সাহেব আর কেউ ছিলেন না। লম্বা সুপুরুষ
চেহারা, গায়ের রঙ ধপধপে, দাঢ়ি গৌঁফ কামানো, পরনে সুট আর টাই। সুটের
কেটটা একটু বেঁটে, এছাড়া খুঁত ধরার জো নেই। হলঘরে কোনো অনুষ্ঠান হলে
ইনি দাঁড়িয়ে থাকতেন হাত দুটো পেটের উপর জড়ো করে। হাততালির প্রয়োজন
হলে দুটো হাত উঠান না কখনো; একটা হাত পেটের উপরেই থাকত, অন্যটা
তার পিঠে মৃদু মৃদু আঘাত করত।

মিঃ লাহিড়ীর ইংরিজি উচ্চারণ ছিল সাহেবের মতো। ওয়ল্টের স্কটের
আইভান হো পড়ানোর সময় স্কটের ফরাসী নামগুলোর উচ্চারণ শুনে ভুক্ত
একেবারে সপ্তমে চড়ে গেল। Front-de-Boeuf-এর উচ্চারণ যে ফ্রঁদৰো
হতে পারে সেটা কে জানত?

যোগেশবাবুর পরে ইনিই হেডমাস্টার হয়েছিলেন; কিন্তু ততদিনে
ইঞ্জিলের পাট শেষ হয়ে গেছে।

অন্য মাস্টারমশাইদের মধ্যে এক-একজন এক-একটি টাইপ। তখন বিশিষ্ট
আগল। সরকারী ইঙ্গুলের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দু মাস্টারমশাইদের সঙ্গে কিছু
মুসলমান ও কিছু বাঙালী ক্রিচান থাকাটা ছিল স্বাভাবিক। মুসলমানদের মধ্যে
ছিলেন আহমেদ স্যার, জসীমউদ্দীন আহমেদ, যিনি কোড়াককে বলেছিলেন
কোদক। এছাড়া আরো দুজন আমাদের পড়িয়ে গেছেন, তার মধ্যে একজন
হলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। ইনি বছর খানেক আমাদের বাংলা পড়ালেন। এর
একটি কবিতা আমাদের পাঠ্যের মধ্যে ছিল, যার প্রথম দু লাইন হল—

আনমনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে...

ମୋତାଫା ସାହେବ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗେର ଲୋକ, 'ଚ' ଆର 'ଛ'-କେ ଇଂରିଜି ଏସ-ଏର ମତୋ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେନ । ଭାରୀ ଦରଦେର ସଙ୍ଗେ କବିତାଟି ପଡ଼ିଲେନ ତିନି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣେ କିଛୁ ତାଁଦିନ୍ଦ ଛେଲେ ବୁଝେ ନିଲ ଏକଟୁ ରଗଡ଼ କରା ଯାଏ । ଗୋପାଳ ଆଗହେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ କରଲ, 'ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସେ ସମୋଟେ ଗଲିତେ ସମୋଟେ ମେଯେ ଦେଖାର କଥା ଲିଖେଇନ, ଏଟା ସମୋତ୍ତି ଘଟନା ଯାର ?'

କଥା ଲଖେଇନ୍, ଏବା । ...
ମୋଟାଫା ସାହେବ ସରଳ ମାନୁଷ, ବଲଲେନ, ‘ହଁ, ସତି । ସତିଇ ଆମି ଏକଦିନ
ଗଲି ଦିଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଖି ଏକଟି ଛୋଟ ମେଘ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆଛେ । ଆମି ତାର ପାଶ
ଦିଯେ ଘାବାର ସମୟ ତାର ମାଥାଯ ଟୁକ କରେ ଏକଟା ଟୋକା ମେରେ ଦିଲାମ ।’

‘টোকা মারলেন স্যার ? বাঃ !’
কথা আর বেশি এগোলো না, কারণ পিছন থেকে ‘আই গোপলা, বোস’ বলে
চাপা ফিসফিসে রব উঠেছে ।

চাপা ফসাফনে রয় উচ্চে।
মাস্টারমশাইদের মধ্যে ক্রিশ্চান ছিলেন দুজন—বি. ডি. স্যার আর
মনোজবাবু। বি. ডি. অর্থাৎ বি. ডি. রায়। পুরো নাম বোধহয় বিভূদান কি
বিধুদান। এমন নাম এর আগে বা পরে কখনো শুনিনি। ইনি পড়াতেন ইংরিজি।
ছেটখাটো মানুষ, ইংরিজি উচ্চারণ যাতে ঠিক হয় সেদিকে বিশেষ নজর।
ঈশ্বপের গল্প The Ox and the Frog পড়াবার আগে বলে নিলেন,
'ভাওয়েলের আগে The-এর উচ্চারণ হবে দি, আর কনসোনেন্টের আগে দ্য।
দি অঙ্গ অ্যাণ্ড দ্য ফ্রগ। আর ইংরিজি দ-এর উচ্চারণ বাংলা দ-এর মতো নয়।
বাংলা দ বলার সময় জিভ আর টাকরার মধ্যে কোনো ফাঁক থাকে না, কিন্তু
ইংরিজির সময় সামান্য ফাঁক থাকবে যাতে খানিকটা হাওয়া বেরোয়। আসলে
ইংরিজি দ-এর উচ্চারণ দ আর Z-এর মাঝামাঝি।'

ମନୋଜବାସୁର ଏକ ଭାଇ ପୁଲିଶେ କାଜ କରେଣ । ତାଁର ବାସଥାନ ଛିଲ ଆମାଦେର ଇନ୍ଦ୍ରଲେର ଲାଗୋୟା ଥାନାଯ । ଏହି ପୁଲିଶ ଭାଇଯେର ଦୁଇ ଛେଲେ ସୁକୁମାର ଓ ଶିଶୀର ପଡ଼ିତ

যথন ছেট ছিলাম

আমাদের ক্লাসে। এরা ইঙ্গুলে আসত পাঁচিল টপকে। সুকুমার আমাদের ক্লাসের সেরা দৌড়বাজ, দুবার পর পর হান্ডেড ইয়ার্ডসে জিতেছে। শিশিরটা মিচকে, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিল চড় কানমলা তার দৈনিক বরাদ্দ, বিশেষ করে তার কাকার হাতে। মনোজবাবু পড়ানোর সময় চোরারে প্রায় বসেন না বললেই চলে; টেবিলে ঠেস দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে হাতে বই নিয়ে ক্লাস নেন। একটা অস্তুত মুদ্রাদোষ—মাঝে মাঝে ডান কাঁধটা ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে আর ঘাড়টা ডাইনে হেলে পড়ে, যেন মাছি তাড়াচ্ছেন। আর প্রচণ্ড অন্যমনশ্ব। কখন যে কিসের কথা ভাবেন সে এক রহস্য। তার উপর ঠৌঁটের ডগায় লেগে আছে ‘ভেরি গুড’।—‘একটু বাইরে যাব স্যার?’ ‘ভেরি গুড’। আমরা চুপ। বাইরে যাবার মধ্যে ভেরি গুডের কী আছে? পরক্ষণেই নিজের ভুল বুৰতে পেরে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, ‘এই তো গেলি বাইরে, আবার কেন?’

হেড পশ্চিমশাই ভট্টায়ি স্যারের কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তাঁর হাতের লেখার জন্য। ব্ল্যাকবোর্ডে এত সুন্দর বাংলা লেখা আর কেউ লিখতে পারে বলে মনে হয় না।

সেকেও পঞ্জিতমশাইকে কেন যে সবাই ভ্যান পঞ্জিত বলত তার কারণ কোনোদিন জানতে পারিনি। নামকরণটা হয়ে গিয়েছিল আমি আসার আগেই। এঁকেও কোনোদিন হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবে গোমড়া মেজাজ হওয়া সত্ত্বেও, উনি ছাত্রদের সামলানোর ব্যাপারে তেমন দুরস্ত ছিলেন না। এনার একটা ধরক এখনো কানে লেগে রয়েছে—‘চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা দিয়ে বুক্সের গঙ্গা বয়ে গেল, তাও তোমার মনোযোগ দিচ্ছ না?’

এনার হাত যে চলত খুব বেশি তা নয়, কিন্তু একবার অজয়কে কানের পাশে চড় মেরে প্রায় অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। সেদিন সারা ইস্কুল সরগরম। টিফিনের আগের ক্লাসে ঘটনাটা ঘটেছে, টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেছে, কিন্তু ক্লাস থেকে কেউ বেরোয়ানি। অজয় মুখ লাল করে হাত দিয়ে কান ঢেকে মাথা হেঁট করে বসে আছে, ছেলেরা তাকে ঘিরে রয়েছে, পশ্চিমশাইকেও একরকম ক্লাসেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। বাইরে থেকে ক্লাসরুমের বক্ষ দরজার খড়খড়ি ফাঁক করে অন্য ক্লাসের ছেলেরা ‘ভান ! ভান !’ করে টিকিবি দিচ্ছে।

ପ୍ରହାର ଛାଡ଼ା ଆରେକ ରକମେର ଅନ୍ତ୍ର କୋନୋ କୋନୋ ମାସ୍ଟରମଶାଇ ବୁବହାର କରିଲେ ଯେଟା ପ୍ରହାରେର ବାଡ଼ା । ସେଟା ହଳ ବାକ୍ୟବାଣ । ରମଣୀବାବୁ ଛିଲେନ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଅନ୍ଧିତ୍ୟ । ତାଁର ଦୌତଥିଚିନ୍ତା ଚେହରାଟା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପେର ଜନ୍ୟ ସବ ସମୟ ତୈରି ହେଁ ଥାକିଲା । ସଞ୍ଜୟ ବଲେ ଏକଟି ନତୁନ ଛେଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହଳ—ତଥନ ଆମରା ବୋଧହୟ କ୍ଲାସେ ଏହିଟେ । ଜାନା ଗେଲ ଠାକୁରବାଡ଼ିର ସଙ୍ଗେ ତାର ଏକଟା ସମ୍ପର୍କ ଆଛେ । ଛେଲେର ମନ୍ଦରାଜାର ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବେ କେନ ? ଆମାର ବେଳାତେଓ ଛାଡ଼େନି । ଆମି ଯେ ସକ୍ରମାର ଏ

রায়ের ছেলে আর উপেন্দ্রকিশোরের নাতি এটা গোড়াতেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ক্রমে বেরিয়ে পড়ল এইচ. এম. ভি-র আর্টিস্ট কনক দাশ আমার মাসি আর বাংলার সেরা ক্রিকেটার কর্তিক বোস আমার কাকা। এর কয়েকদিন বাদে আমাকে শুনতে হল, ‘হাঁরে মানিক, অমল বলছিল পঞ্চম জর্জ নাকি তোর দাদু; সতি নাকি?’ সেইরকম ‘রবিবাবু তোর কে হন রে? জ্যাঠামশাই?’—এ প্রশ্ন সঞ্চয়কে অনেকবার শুনতে হয়েছে। দোষের মধ্যে সঙ্গমের রংটা শুধু উগ্র রকম ফরসা নয়, তার সঙ্গে বেশ খানিকটা গোলাপীর ভাগে খুব বেশি পড়েনি সেটা কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। রমণীবাবু সেটা আঁচ করে নিয়ে তার দিকে ছাড়লেন বাক্যবাণ—‘এই যে মাকাল ফল, মাকাল ঠাকুর—তোমার কান দুটো আরেকটু লাল করে দেব নাকি, আঁ? এসতোকাছে বাপু!'

রমণীবাবুর এই হাঁকা দেওয়া কথা সহ করার ক্ষমতা আমাদের কারুরই ছিল না। কিন্তু এমন মাস্টারমশাইও ছিলেন যাঁদের রাগ যাতে বেশিদূর এগোতে না পারে তার ব্যবস্থা করা ছাত্রদের অসাধ্য ছিল না। ব্রজেনবাবু ছিলেন আমাদের প্রিয় মাস্টারমশাইদের মধ্যে একজন। কড়া কথা তার মুখ দিয়ে খুব বেশি শোনা যায়নি। ছাত্রেরা বেশি গোলমাল করলে তিনি ভারী ব্যস্ত হয়ে বলতেন ‘Cease talking! Cease talking!’ তাতে সব সময় যে খুব কাজ হত তা নয়। একবার এই অবস্থায় আর থাকতে না পেরে ব্রজেনবাবু একজন ছাত্রের দিকে চেয়ে হাঁকলেন, ‘আই, তুই উঠে আয় এখানে।’

শাস্তিটা কী হবে জানা নেই; হ্যত ক্লাসরুমের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হবে। ছাত্রটি উঠে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ অলোক তার জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে ব্রজেনবাবুকে জড়িয়ে ধরল।

‘স্যার, আজকের দিনটা ওকে মাপ করে দিন স্যার।’

ব্রজেনবাবুর রাগ তখনো পড়েনি, তবে তিনি এই অপ্রত্যাশিত বাধাতে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, ‘কেন, আজকের দিনটা কেন?’

‘আজ মার্চেন্ট সেপ্টুরি করেছে স্যার।’

এই ব্রজেনবাবুরই একদিন সরকারী ডাক পড়ল এক বিখ্যাত খনের মামলায় জুরি হবার জন্য। এ ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই; ব্রজেনবাবুকে তাই মাঝে মাঝে ইঞ্জুল কামাই করে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। পাকুড় হত্যার মামলায় তখন কলকাতা সরগরম। জমিদারী খনে মামলা, সেই নিয়ে কত বই বেরোচ্ছে হপ্তায় হপ্তায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রী হয় সেগুলো আর লোক হৃষ্মতি দিয়ে কিনে নিয়ে গোগাসে গেলে। ব্রজেনবাবু কোর্টে হাজিরা দিয়ে পরদিন ইঞ্জুলে এলেই

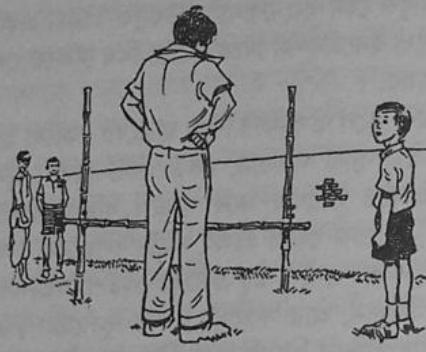
যখন ছোট ছিলাম

আমরা তাঁকে ছেঁকে ধরি—‘স্যার, মামলায় কী হল বলুন স্যার!’ পড়াশুনা শিকেয় ওঠে, কারণ ব্রজেনবাবুও যেন গল্প শোনাতে উৎসুক। টানা এক ঘণ্টা ধরে হাওড়া স্টেশনের ভীড়ের মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার লোমহর্ষক হত্যার গল্প শুনি আমরা।

বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে তখনকার দিনে ছাত্রদের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। আমরা কেউ কেউ হাফপ্যান্ট পরতাম, কেউ কেউ ধূতি। মুসলমান ছেলেদের পায়জামা পরেও আসতে দেখেছি মনে পড়ে। ধূতির সঙ্গে সার্ট পরাই ছিল রেওয়াজ, আর একটু লায়েক ছেলে হলেই সার্টের পিছনের কলারটা দিত তুলে। স্পোর্টসম্যান হলেতোকথাই নেই। উঁচু ক্লাসের কেষ্টদা, যতীশদা, হিমাংশুদা, এরা সকলেই খেলোয়াড় ছিলেন, আর সকলেই কলার তুলতেন। এর মধ্যে কেষ্টদার রীতিমতো দাড়ি গৌঁফ গজিয়ে গিয়েছিল ম্যাট্রিক ক্লাসেই; দেখে মনে হত বয়স অন্তত উনিশ কুড়ি তো হবেই। আমরা মাত্র চার ক্লাস নিচে পড়েও অনেক বেশি ছেলেমানুষ, দাড়ি গৌঁফের কোনো লক্ষণ তো নেই-ই—অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না।

কলার তোলার যিনি রাজা, তিনি কিন্তু ছাত্র নন, তিনি শিক্ষক। ড্রিল স্যার সনৎবাবু। ইনি যখন এলেন তখন ইঞ্জুলে তিনি বছর হয়ে গেছে আমার। চোখ চুলু চুলু বায়স্কোপের হিরো হিরো চেহারা, আর সার্টের কলার এত বড় আর ছড়ানো যে কাঁধ অবধি পোঁছে যায়। তার উপর সেটা তুলতে মনে হল ড্রিল স্যার বুঁধি ওড়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এখন যেটাকে পি. টি. বলা হয়, তখন সেটাই ছিল ড্রিল। সপ্তাহে দুটো কি তিনটে দিন একটা ঘণ্টা ইঞ্জুলের মাঠে কাটাতে হত। ড্রিল স্যারের তখন মিলিটারি মেজাজ। নানারকম কুচকাওয়াজের মধ্যে হাই জাপ্পের ব্যবস্থা আছে। মাটি থেকে হাত দুয়েক উঁচুতে শুইয়ে রাখা বাঁশ টপকে পেরোতে হবে। যে ইতস্তত করবে তারই প্রতি হৃকার ছাড়বেন ড্রিল স্যার—‘আই সে জাঁ—প!’ ভদ্রলোক Jump কথাটা জাম্প আর বাঁপের মাঝামাঝি করে নিয়েছেন হকুমটা আরো জোরদার হবে বলে। এই জাঁপের হকুম আমাকেও শুনতে হয়েছে, কারণ ছেলেবেলায় ডেঙ্গু নামে এক বিটকেল অসুখে আমার ডান পা-টা কমজোর হয়ে যাবার ফলে আমি লফবাম্পে কোনোদিনই বিশেষ পারদর্শী হতে পারিনি।

যে জিনিসটা ছেলেবয়স থেকে বেশ ভালোই পারতাম সেটা হল ছবি আঁকা। সেই কারণে ইঞ্জুলে তোকার অঞ্জদিনের মধ্যেই আমি ড্রইং মাস্টার আশুবাবুর প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলাম। ‘সইত্যাটিত’ নামেও সইত্যাটিত কাজেও সইত্যাটিত’ কথাটা অনেকবার বলতে শুনেছি আশুবাবুকে যদিও কাজেও সত্তজিৎ বলতে উনি কী বোঝাতে চান সেটা বুঝতে পারিনি। রোগা পটকা মানুষ, চোখা নাক, সরু



গোফ, হাতের আঙুলগুলো সক লম্বা, টাক মাথার পিছন দিকে তেলতেলে লম্বা চুল। গভর্নমেন্ট আর্ট ইন্সুল থেকে আঁকা শিখেছেন, তবে ইংরিজিটা আদৌ শেখা হয়নি। ছাত্রা সবাই সেটা জানে, আর জানে বলেই ক্লাসে নোটিস এলেই সবাই সমন্বয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—‘স্যার, নোটিস !’ আশুব্বাবু দারোয়ানকে চুকতে দেখলেই একটা যে কোনো কাজ বেছে নিয়ে তাতে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করে বলেন, ‘দিলীপ, নোটিসটা একটু পড়ে দাও তো বাবা !’ দিলীপ ক্লাসের মনিটো। সে নোটিস পড়ে আশুব্বাবুর সমস্যা মিটিয়ে দেয়। একদিন আমার একটা ছবিতে আশুব্বাবু নম্বৰ দিলেন $10+F$ । সবাই ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখে বলল, ‘ফ্লাস এফ কেন স্যার ?’ আশুব্বাবু গন্তির ভাবে বললেন, ‘এফ হল ফাস্ট !’

বাংসরিক প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের কিছুদিন আগে থেকে আশুব্বাবুর ব্যস্ততা বেড়ে যেত। হল সাজানোর ভাবে তাঁর উপর। ছেলেদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হবে সেটার দায়িত্বও তাঁর। প্রাইজের আগে বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা মার্ক মারা আইটেম আছে সেটাতেও আশুব্বাবুর অবদান আছে। আইটেমটাকে বলা হয় মিউজিক ড্রাইং। এটা বোধ হয় ইন্সুলের শুরু থেকেই চালু ছিল। স্টেজের উপর ব্ল্যাকবোর্ড আর রঙীন চকখড়ি রাখা থাকবে। একজন ছাত্র একটি গান গাইবে, আর সেই সঙ্গে আরেকজন ছাত্র গানের সঙ্গে কথা মিলিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকবে। আমি থাকাকালীন প্রতিবারই একই গান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের ‘অমল ধূল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।’ শেষের দু’বছর বাদে প্রতিবারই একই আর্টিস্ট ছবি এঁকেছে—আমাদের চেয়ে তিনি ক্লাস উপরের পড়ুয়া হরিপদদা। এটা বলতেই হবে যে হাত আর নার্ত, এই দুটো জিনিসের উপরই আশ্চর্য দখল ছিল হরিপদদার। হল-ভৱি

লোকের সামনে নার্তস না হয়ে সেটান ব্ল্যাকবোর্ডে ছবি আঁকাটা চাটিখানি কথা নয়, কিন্তু হরিপদদা প্রতিবারই সে পরীক্ষায় চমৎকার ভাবে উৎরোতেন। ১৯৩৩-এ ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ইন্সুলথেকে বেরিয়ে গেলেন। এবার কে নেবে তাঁর জায়গা ? আশুব্বাবুর ইচ্ছে আমি নিই, কিন্তু আদৌ রাজী নই। এর সহজ কারণ হচ্ছে, আমার মতো স্টেজভীতি সচরাচর দেখা যায় না। কোনো বিষয়ে প্রাইজ পাওয়া শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে, কারণ অতগুলো লোকের সামনে আমার নাম ডাক হবে, আমি জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে হোমরা-চোমরা কারুর হাত থেকে প্রাইজ নেবো, তারপর আবার হেঁটে আমার জায়গায় ফিরে আসব, এটা আমার কাছে একটা আতঙ্কের ব্যাপার। কাজেই মিউজিক ড্রাইং-এর ভাব শেষ পর্যন্ত পড়ল সুরঞ্জনের উপর। ছবি একই : নদীতে সাদা পাল তোলা নৌকো, আকাশে থোকা থোকা সাদা মেঘ, মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ওপারের গাছপালার পিছন দিয়ে—কিন্তু হরিপদদার পারিপাট্য আর হাতের জোর নেই।

অনুষ্ঠানের সূচীর মধ্যে আমি থাকার শেষ তিনি বছর দুটি জিনিস কখনো বাদ পড়েনি। এক হল মাস্টার ফুলুর তবলা, আরেক হল জয়স্তর ম্যাজিক। ফুলু আমাদের চেয়ে ক্লাস তিনিক নিচে পড়ত। ৭ বছর বয়স থেকে তবলা বাজায়। পরে আরেকটু বড় হয়ে আসর-টাসরেও বাজিয়েছিল। জয়স্ত আমার চেয়ে দু’ক্লাস উপরে পড়ত, পর পর দুবার ফেল করে আমাদের ক্লাসে এসে যায়। পরীক্ষায় যে সে পাশ করবে না সেটা বুঝেছিলাম যখন সে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাস বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরাও লক্ষ করছিলাম সে খাতার দিকে না চেয়ে বাব বাব নিজের কোলের দিকে চাইছে। কোলে বই খোলা আছে কি ? যে মাস্টারমশাই গার্ড দিচ্ছিলেন তিনিও ব্যাপারটা দেখে হন্হনিয়ে এগিয়ে গেলেন জয়স্তর গার্ড দিকে।—‘নিচে কী দেখা হচ্ছে ?’ জয়স্ত হাত তুলে দেখিয়ে দিল তাতে একটি আস্ত মর্তমান কলা।—‘টিফিনে খাব স্যার। তাই দেখে নিচ্ছিলাম ঠিক আছে কিনা।’

জয়স্ত ম্যাজিক অভ্যাস করছে দশ-এগারো বছর বয়স থেকে। স্টেজের ম্যাজিক ছাড়াও আরো ভেলকি জানে সে। আমাদের ক্লাসে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখি ক্লাসে বসে বসেই পরিমল হঠাত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কী ব্যাপার ? —না, জয়স্ত কয়েক মিনিট ধরে পরিমলের গলার দুদিকের দুটো রগ টিপে ধরে বসে ছিল। তার থেকেই এই কাণ। জয়স্ত বুঝিয়ে দিল ও দুটো রগকে বলে carotid arteries। ওগুলো টিপে রাখলে মন্তিকে রক্ত চলাচল কমিয়ে দিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করে দেয়। তবে রগ ছেড়ে দেবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়ে যায়, আর জ্ঞান ফিরে আসে।

হাত সাফাই-এর ম্যাজিকে জয়স্ত ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে সে যে আরো অনেক



বেশি অগ্রসর হচ্ছে সেটা জেনেছিলাম আমাদেরই ক্লাসের অসিতের জন্মাদিনের নেমন্তন্ত্রে। অসিত জয়স্তকে ডেকেছিল ম্যাজিক দেখানোর জন্য। খাওয়ার পর ম্যাজিক হবে, খাওয়ার মধ্যে কাচের জলের গেলাস হাতে নিয়ে জল খেয়ে হঠাৎ গেলাসটাকেই কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে আরস্ত করে দিল জয়স্ত। কাচ খাওয়া, পেরেক খাওয়া, এ সবই ইঙ্কুলে থাকতেই শিখেছিল। ইঙ্কুল ছাড়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই শুনলাম অ্যাসিড খেয়ে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে জয়স্ত মারা গেছে।

আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনিলের কথাটা আলাদা করে বলা দরকার, কারণ তার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। অনিল খুব অল্প বয়সে বেশ কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিল একটা কঠিন ব্যারাম সারানোর জন্য। সেরে উঠে দেশে ফিরে ১৯৩৩-এ ভর্তি হয় আমাদের ক্লাসে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। সঞ্চয়ের যেমন ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অনিলেরও পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন বিখ্যাত বাঙালী ছিলেন। একবার বি. টি.-র এক ছাত্র আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন, রোমান ইতিহাস পড়াতে গিয়ে এন্টুরিয়ার রাজা লার্স পোরসিনার নাম উল্লেখ করামাত্র মিচকে ফর়ুখ বলে উঠেছে, ‘কী বললেন স্যার, লর্ড সিনহা?’ পিছনেই বসেছিল অনিল। সে ফর়ুখের মাথায় মারল এক গাঁটা। কারণ আর কিছুই না, এই লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অনিলের দাদামশাই। অনিল নিজে ছাত্র ছিল খুব চতুর; বহুদিন বিদেশে থাকার জন্য বাঙালায় খুব কাঁচা, কিন্তু পুষিয়ে নিত ইংরিজি আর অঙ্কে। বাবার একমাত্র ছেলে আর অবস্থাপন ঘরের ছেলে বলে অনিলের ভাগ্যে কিছু জিনিস জুটে যায় যেটা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। নেস্লে কোম্পানি তখন তাদের এক-আনার চকোলেটের প্যাকেটে এক ধরনের

যখন ছেট ছিলাম

ছবি দিতে আরস্ত করেছে। ছবিগুলো একটা সিরিজের অন্তর্গত, নাম ওয়ানডারস্ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। নেস্লেই অ্যালবাম বার করেছে, সেই অ্যালবামে ছবিগুলো সেঁটে রাখতে হয়। আমাদের সকলের মধ্যে কম্পিউটাশন লেগে গেল কার গ্যালবাম আগে ভরতি হয়। মুশকিল হচ্ছে কী, প্রত্যেক প্যাকেটেই যে নতুন ছবি পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। অনিলের পয়সা আছে, সে একসঙ্গে একশো প্যাকেট চকোলেট কিনে একদিনেই প্রায় অ্যালবাম ভরিয়ে নিল। ওর সঙ্গে পাল্লা দেবে কে? অবিশ্য যে ছবি একটার বেশি হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সে অন্যদের বিলিয়ে দিল অকাতরে, কিন্তু নিজে কিনে পাবার মতো মজা আছে কি তাতে? আমরা ডেক্সের মাঝখানে বসানো নীল কালির দোয়াতের মধ্যে রেড ইঙ্ক আর রিলিফ নিব ডুবিয়ে লিখি, আর অনিল লেখে পার্কারি ফাউন্টেন পেন। আমরা পাঁচ টাকার বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলি, অনিল হঠাৎ একদিন একটা পাঁচশো টাকার জার্মান লাইকা ক্যামেরা নিয়ে এল, সঙ্গে সাউথ ক্লাবের টেনিস টুর্নামেন্টের এনলার্জ করা ছবি। কলকাতায় যখন প্রথম ইয়ো ইয়ো বেরোল, অনিল এক সঙ্গে গোটা আঁষ্টেক কিনে নিয়ে এল ইঙ্কলে। তারপর অবশ্য অনেকেই কিনল এই মজার খেলার জিনিসটা। একদিন তো দেখি অনিল এক জোড়া রোলার স্কেটস কিনে নিয়ে এসেছে। টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে চাকা লাগানো জুতো পরে বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা গড়িয়ে বেড়াতে লাগল।

টিফিনের এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া এবং খেলা দুটোই চলত। অনেক ছেলে বাড়ি থেকে টিফিন বাস্তে খাবার নিয়ে আসত। আমরা খেতাম এক পয়সায় একটা করে আলুর দম। শালপাতার ঠোঙ্গায় বিক্রী হত এই আলু, সঙ্গে একটি কাঠি, সেই কাঠিতে আলুটা বিধিয়ে মুখে পুরে দিতে হত। একদিন টিফিনের সময় দেখি অঙ্গুত এক নতুন খাবারের আমদানি হয়েছে। কাগজে মোড়া মাখনের

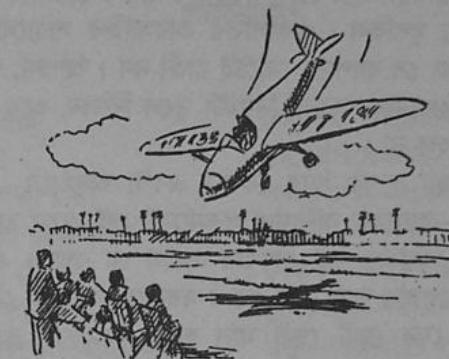


প্যাকেটের মতো দেখতে আইসক্রীম—নাম ‘হ্যাপি বয়’। বাঙালী কোম্পানি। রাস্তায় ফেরি করা আইসক্রীম সেই প্রথম। কিছুদিনের মধ্যেই শহরের সর্বত্র দেখা যেতে লাগল হ্যাপি বয় আইসক্রীমের ঠেলা গাড়ি। হ্যাপি বয় উঠে যাবার পর এল মাগনোলিয়া, আর তারও অনেক পরে কোয়ালিটি-ফ্যারিন।

ମ୍ୟାଗନୋଲାରୀ, ଆର ତାରିତ ହେବେ—
ଟିଫିନ ଟାଇମ୍ରେ ଖେଳାର ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି-ଡାଂଗୁଣି ଛାଡ଼ା ଯେଟା ବିଶେଷଭାବେ ଚାଲୁ ଛିଲ
ସେଟା ହଲ ଲାଟୁ । ଯଗୁବାବୁର ବାଜାରେର କାହେ ମିତ୍ର ମୁଖାଜିର ଦୋକାନେର ସିଡ଼ିତେ
ବିକେଳେ ଦୋକାନ ପେତେ ବସନ୍ତେ କଲକାତାର ସେଇ ଲାଟୁ ବାନାନେଓୟାଲା ଶୁଣୀବାବୁ ।
ଲାଟୁ ଯେ କତ ଭାଲୋ ଘୁରତେ ପାରେ ସେଟା ଶୁଣୀବାବୁର ଲାଟୁ ଘର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଦେଖେନି ସେ
ଜାନନ୍ତେ ପାରେ ନା । ସେଇ ଲାଟୁ ଗଚ୍ଛା ମେରେ ଅନ୍ୟେର ଲାଟୁ ଫାଟିଯେ ଦେବାର ଖେଳ ଚଲତ
ଟିଫିନେ । ତାହାଡ଼ା ହାତ ଲେଣ୍ଟି, ଡ୍ରିନ ଲେଣ୍ଟି, ଘୁରନ୍ତ ଲାଟୁକେ ହାତ ଥେକେ ଲେଣ୍ଟିତେ
ଢଳେ ନିଯେ ଆବାର ହାତେ ତୁଲେ ନେଓୟା—ଏସବତୋ ଆଛେଇ । ଏକବାର ଗଚ୍ଛା ଲାଟୁର
ଗାୟେ ନା ଲେଗେ ଲାଗଲ ଅମଲେର ପାଯେ, ଆର ପାଯେର ପାତା ଥେକେ ତୃଙ୍କଣାଏ
ଗଲଗଲିଯେ ରଙ୍ଗୁ ।

গণগানের রঙ।
খেলতে গিয়ে এই ধরনের বিপত্তি আরো হয়েছে—যেমন হল অ্যানুয়াল স্পোর্টসে সুশাস্ত্র। আমাদেরই ক্লাসের ছেলে, স্পোর্টস আর পড়াশুনা দুটোতেই ভালো। স্পোর্টসে একটা আইটেম ছিল ব্লাইগুফোল্ড রেস। মাঠের এক কোণ থেকে আরেক কোণে একশো গজ দৌড়ে আসতে হত চোখ বাঁধা অবস্থায়। রেস শুরু হল; সুশাস্ত্র যে লাইন রাখতে পারেনি, মাঝপথে বাঁয়ে সরে এসেছে, সেটা দেখতেই পাচ্ছি। কে একজন তার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল তাকে সাবধান করে দেবার জন্য। সুশাস্ত্র ভড়কে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থেমে পরমুহূর্তেই দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে গিয়ে ফিনিশিং পোস্ট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত বাঁয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় সোজা ধাক্কা খেল ইস্কুল কম্পাউণ্ডের দেয়ালে। সেই দৃশ্য, আর ধাক্কার সেই শব্দের কথা ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। তার পরের বছর থেকে অবিশ্য ব্লাইগুফোল্ড রেস ব্যাপারটাই উঠে যায়।

ইন্সুলের প্রথম চারটি বছর আমি বকুলবাগান রোডেই ছিলাম। ক্লাস নাইলে থাকতে সোনামামা বাড়ি বদল করে চলে গেলেন বেলতলা রোডে। এবাড়ি আগের বাড়ির চেয়ে কিছুটা বড়। বেলতলায় আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন চিত্তরঞ্জন দাশের জামাই ব্যারিস্টার সুধীর রায়। তাদের হাল্কা হলদে রঙের গাড়িই আমার প্রথম দেখা ডাকসাইটে জার্মান গাড়ি মাসেডিজ বেন্স। সুধীরবাবুর ছেলে মানু ও মন্দু আমার বন্ধু হয়ে গেল। মানুও পরে ব্যারিস্টারি করে, আর আরো পরে রাজনীতি করে বাংলার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী হয়। তখন লোকে তাকে জানে সিন্ধার্থশংকর রায় নামে।



পাড়ায় একটা ছেলেদের ক্লাব আছে, আমি বেলতলা যাবার দু'একদিনের মধ্যে ক্লাবের ছেলেরা দল করে এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। মানু-মন্টুও সেই ক্লাবের সভ্য। আমাদের দুটো বাড়ি পরেই আরেক ব্যারিস্টার নিশ্চিথ সেনের বাড়ি, সে বাড়ির বড় মাঠে ক্রিকেট হকি খেলা হয়, আর মানুদের ছোট মাঠে হয় ব্যাডমিন্টন। নিশ্চিথ সেনের ছেলে ভাইপো চুনি, ফুনু, অনু সবাই ক্লাবের মেম্বর। আরো মেম্বরদের মধ্যে আছে চাটুজ্যোদের বাড়ির নীল, বলু, অনাথ, গোপাল। ইস্কুলে থাকতেই সঙ্গী-সাথী হয়েছিল—তারা বাড়ির বাইরে এসে রাস্তা থেকেই আমার ঘরের দিকে মুখ করে পাড়া কঁপিয়ে হাঁক দিত—‘মানিক, বাড়ি আছিস?’ এখন তাদের সঙ্গে আরো নতুন সাথী যোগ হল।

আরেকটি ছেলে ছিল, সে সাউথ সুবারবন ইস্কুলেপড়ে আমাদের একই ক্লাসে, যদিও আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। পর পর কয়েক বছর ফেল করেই বোধহয় এই দশা। এই অর্ণ, ডাকনাম পানু, হল ময়মনসিংহের অধিবস্থ গৃহদের বাড়ির ছেলে; থাকে নিশ্চিথ সেনের উত্টোলিকের বাড়িতে। আমাদের ক্লাবের সভ্য হওয়া সঙ্গেও বুকি কম বলে তাকে বিশেষ কেউ পাত্তা দেয় না। সেই পানুও হঠাৎ একদিন দমদমের ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়ে এরোপ্লেন চালানো শিখে ফেলল। তারপর ফ্লাইং ক্লাবের বাংসরিক উৎসবে সে আমাদের দমদমে নেমস্তন্ম করে নিয়ে গিয়ে টু-সীটার প্লেনে আকাশে উঠে পর পর ভীষণ শব্দে আমাদের দিকে ডাইভ করে নেমে এসে আবার উঠে গিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিল। এর পর থেকে অবিশ্য আমরা পানকে বেশ সমীহ করে চলতাম।

আমাদের সময় একটা সরকারী নিয়ম ছিল যে পনেরো বছর বয়সের কমে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া চলবে না। আমাদের পরীক্ষা হবে ১৯৩৬-এর মার্চ

মাসে। তখন আমার বয়স হবে চোদ্দ বছর দশ মাস। তার মানে এক বছর বসে থাকতে হবে। মহা মুশ্কিল। ওকালতির কারসাজির সাহায্যে বয়স বাড়িয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মা সে ব্যাপারে মোটেই রাজী নন। আশ্চর্য, পরীক্ষার কয়েক মাস আগেই সরকারপনেরে বছরের নিয়মটা তুলে দিলেন, আর আমাকেও এক বছর বসে থাকতে হল না।

ইঙ্গুল ছাড়ার বছর দশকে পরে কোনো একটা অনুষ্ঠানে, বোধহয় পুরানো ছাত্রদের সম্মেলনে—আমাকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে যেতে হয়েছিল। হলঘরে চুক্ত মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই হলঘরে চুক্ত মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই হলঘরে চুক্ত মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই হলঘরে চুক্ত মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ ঘর কি সেই হলঘরে চুক্ত মনে হয়েছিল—এ কোথায় এলাম রে বাবা!

অবিশ্য হবে নাই বা কেন। যখন ইঙ্গুলছেড়েছি তখন আমি ছিলাম পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর এবার যে ফিরে এলাম, এখন আমি প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। ইঙ্গুলতো আছে যেই কে সেই, বেড়েছি শুধু আমিই।

এর পরে আর ইঙ্গুলে ফিরে যাইনি কখনো। এটাও জানি যে যে-সব জায়গার সঙে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, সে সব জায়গায় নতুন করে গেলে পুরানো মজাগুলো আর ফিরে পাওয়া যায় না। আসল মজা হল স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ে সেগুলোকে ফিরে পেতে।

পরিচয়লিপি

- বাবা—সুকুমার রায়
 মা—সুপ্রিয়া রায়
 কাকীমা—পুষ্পলতা রায়
 বুলুপিসি—মাধুরী মহলানবীশ
 তুতুপিসি—ইলা চৌধুরী
 সোনাঠাকুমা—মুণ্ডলিনী বসু
 হিতেনকাকা—হিতেন্দ্রমোহন বসু
 বাপী—শৈলেন্দ্রমোহন বসু
 বাবু—সোমেন্দ্রমোহন বসু
 বুলাকাকা—প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবীশ
 সোনামামা—প্রশান্তকুমার দাস
 মেসোমশায়, ইনশিওরেন্স কোম্পানির
 মালিক—অবিনাশচন্দ্র সেন
 দিদিমা—সরলা দাশ
 মেজোমামা—সুধীন্দ্রচন্দ্র দাশ
 বড়মামা—চারুচন্দ্র দাশ
 বড়মাসি—প্রতিভা দত্ত
 মানুদা—দলীপকুমার দত্ত
 কালুমামা—বকিমচন্দ্র পাল
- লেবুমামা—হীরেন্দ্রনাথ দশগুপ্ত
 মেজোপিসেমশাই—অরূপনাথ চক্রবর্তী
 পানকুকাকা—করণারঞ্জন রায়
 নিনিদি—নলিনী দাশ
 কুবিদি—কল্যাণী কার্লেকার
 ছুটকিমাসি—প্রভা আয়েঙ্গার
 মন্তু—সঞ্জীবচন্দ্র দাশ
 বাচু—প্রতীপকুমার দাশ
 পুপে—নন্দিনী দেবী
 নন্দলালবাবু—নন্দলাল বসু
 মায়ামাসিমা—মায়া দাশ
 মনুমাসি—গিরিবালা সেন
 মেজোপিসিমা—পুণ্যলতা চক্রবর্তী
 কল্যাণ—কল্যাণকুমার চক্রবর্তী
 লতু—ললিতা রায়
 ডলি—অমিতা রায়
 মেসোমশাই, একসাইজ
 কমিশনার—সুধীন্দ্রচন্দ্র হালদার
 রণদা—রণজিৎ সেন